গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৯ - ১৫ জুন, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

চুক্তিচাষ কি কৃষকের স্বার্থে

'চুক্তিচাষ' প্রবর্তন সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। রাজ্য সরকার নিয়োজিত মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ম্যাকিন্‌সে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্পর্কিত তাদের প্রস্তাবে চুক্তিচাষ প্রচলনের কথা বলেছে এবং তারা দেখানোর চেষ্টা করেছে, এই চাষ প্রচলন করলে রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের অশেষ উপকার হবে। ম্যাকিন্‌সের এই সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার যে কয়েক দফার খসড়া কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছিল, আমরা দেখেছি, সেগুলিও ছিল চুক্তিচাষের গুণগানে পূর্ণ। তখন এই রিপোর্ট ও সুপারিশ নিয়ে রাজ্যে প্রবল আলোড়ন শুরু হওয়ায় সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার সাময়িকভাবে পিছিয়ে যায়। দেশি-বিদেশি পুঁজির সমর্থনপুষ্ট হয়ে সপ্তমবার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা আবার নতুন উদ্যমে এই চুক্তিচাষ প্রথা রূপায়িত করতে চাইছে। কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ স্বামীনাথনের সাথে এই মর্মে সম্প্রতি একপ্রস্থ আলোচনাও হয়েছে এবং আলোচনার শেষে চুক্তিচাষের প্রবল সমর্থক ডঃ স্বামীনাথন জানিয়েছেন — ''চুক্তিচাষ আদতে কৃষকের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বরং চুক্তি অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ন্যূনতম মূল্য পাওয়া সুনিশ্চিত হওয়ায় কৃষকের আয়ের পথ খোলাই থাকে।'' দেখা যাচ্ছে, ম্যাকিন্‌সে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, স্বামীনাথনের মতো বিশেষজ্ঞরা সবাই চুক্তিচাষের জোরদার সুপারিশ করছে। সে যাই হোক, প্রশ্ন হল, কেন এই চুক্তিচাষ প্রচলনের চেষ্টা? এ কার স্বার্থ রক্ষা করবে? দেশি-বিদেশি পুঁজি ও তার সেবাদাস সরকারগুলিই বা এই ধরনের চাষ প্রবর্তনের এত চেষ্টা করছে কেন?

চুক্তিচাষের প্রেক্ষাপট

পশ্চাদ্‌পদতা, অনুন্নত প্রথায় চাষাবাদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য থাকায় এদেশের তথাকথিত মার্কসবাদীরা স্বাধীন ভারতে কৃষির শ্রেণীচরিত্র ধরতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লেনিনীয় শিক্ষাকে প্রয়োগ করে বলেন — এদেশের কৃষি অর্থনীতি পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থায় গভীর মার্কসবাদী প্রজ্ঞা ছাড়া, এটা বোঝা সহজ ছিল না। আজ কৃষিতে পুঁজিবাদী সঙ্কট এত প্রবল যে এদেশের কৃষিপণ্যের চরিত্র ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করলে কারোরই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, পুঁজিবাদী পথেই আমাদের দেশের কৃষি বিকশিত হয়েছে। পুঁজিবাদী পথে বিকাশের এই প্রক্রিয়ায় বর্তমানে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি আপেক্ষিক অর্থে অনেক শক্তিশালী। দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক নিয়মে গ্রামাঞ্চলে একদল মানুষের হাতে জমি ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি সাহায্যে এই গ্রামীণ পুঁজিপতিরা ক্রমশই ফুলেফেঁপে উঠেছে। কৃষিশিল্প গবেষণার জাতীয় কাউন্সিল-এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে — ''সবুজ বিপ্লবের সময় সার, বীজ, সেচ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই বেশি সুবিধা পেয়েছে। তাই অনেক বেশি মুনাফা এই সময় তারাই করেছে।'' এ কারণে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির পরিমাণও অনেক বেড়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে এদেশে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৪,৫৯৪ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০,৯৯৫ কোটি টাকা। এই পুঁজির ৭৯ শতাংশই ব্যক্তিগত (ইকনমিক সার্ভে ১৯৯৮-২০০০)। বর্তমানে এই পুঁজির পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই কৃষিপুঁজি শুধুমাত্র আর কৃষিকাজে আবদ্ধ না থেকে খাদ্যশস্যের ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প, চালকল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে। এছাড়াও আইটিসি, গোদরেজ, হিন্দুস্তান লিভারের মতো বৃহৎ একচেটিয়া শিল্পপুঁজি কৃষিজাত পণ্যকে উপাদান করে শিল্প তৈরি করছে এবং সেজন্য কৃষিতে বিনিয়োগ শুরু করেছে।

কৃষি সম্পর্কে দেশের একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীরও দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জমি এখন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্র। এই গুরুত্ব বর্তমানে এতটাই যে, দেশের সমস্ত অনাবাদি ও পতিত জমি ৫০ বছরের জন্য তাদের কাছে লিজ দেওয়ার দাবি তারা সরকারের কাছে রেখেছে। কৃষি এখন আর ওদের কাছে শুধু শিল্প সহায়ক ক্ষেত্র নয়, ভারতীয় কৃষি নিজেই এখন একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

সিঙ্গুর ঃ কৃষিজমি অধিগ্রহণের চক্রান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

টাটাদের মোটর কারখানার জন্য হুগলির সিঙ্গুরে ৩০০০ বিঘা কৃষিজমি চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন। প্রস্তাবিত জমির ৯০ শতাংশই দু'ফসলি, তিন ফসলি এমনকী চার ফসলি। গরিব কৃষকদের একমাত্র জীবিকার উপায় এই জমি। এই অঞ্চলের কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, বর্গাচাষী সহ সর্বস্তরের গরিব নিম্নবিত্ত মানুষকে শিল্পের নামে ধনেপ্রাণে মেরে টাটা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার বিরুদ্ধে কৃষকরা আজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে। সিপিএম সরকারের কৃষকমারা নীতির প্রতিবাদে কৃষকদের নিজস্ব আন্দোলনের হাতিয়ার 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র নেতৃত্বে আন্দোলনে উত্তাল গোটা সিঙ্গুর। টাটার পরিদর্শন টিম গত ২৫ মে প্রবল কৃষক বিক্ষোভে সিঙ্গুর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ২৯ মে সিঙ্গুরে যান ছলে-বলে-কৌশলে কীভাবে কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া যায় তা দলীয় নেতাদের বোঝাতে। ঐদিনই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক কৃষক কালো ব্যাজ পরে কালো পতাকা নিয়ে নিরুপম সেনের ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার জানান। ১ জুন বিভিন্ন গ্রামের পাঁচ সহস্রাধিক চাষী সিঙ্গুর স্টেশন সংলগ্ন বুড়োশান্তি রেলমাঠ থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে এবং বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিসে ডেপুটেশন দেন। মিছিলে শত শত মহিলার মধ্যে ছিল সংগ্রামী মেজাজ, ছিল জমি রক্ষার অঙ্গীকার। স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কৃষিজমি রক্ষা কমিটির নেতা শঙ্কর জানা, সমীর দাস সহ ১০ জনের প্রতিনিধি দল বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করে জমি না দেওয়ার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে। 'মাটি আমাদের মা, আমাদের জমি দেব না' স্লোগান উঠতে থাকে মুহুর্মুহু। বিশাল কৃষক সমাবেশে এস ইউ সি আই সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, চাষীরা শিল্পমন্ত্রীকে জমি দিয়ে দিয়েছে এই অসত্য প্রচার করে ধূর্ত নিরুপমবাবুরা চাষীদের মনোবল ভেঙে টাটাদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে। চাষীরা বলেছেন — আমরা শিল্পায়নের বিরোধী নই, উন্নয়নের বিরোধী নই, কিন্তু অনাবাদি জমি কেন শিল্পের জন্য বাছাই করা হচ্ছে না। এর মধ্যে রয়েছে দুরভিসন্ধি। এই আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে কৃষক কনভেনশন ও এলাকাভিত্তিক কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

তুরস্কে গুমখুন বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী

তুরস্কের পুঁজিবাদী শাসকদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের তো বটেই, তার সাথে ফ্যাসিস্ট শাসনবিরোধী যেকোন নারীপুরুষকেই অতর্কিতে কোনও কারণ না দেখিয়ে, এমনকী রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় সাদা পোষাকের পুলিশ। এরপর আর তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। তাদের গুম খুন করে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে তুরস্কের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চরিত্র। এর বিরুদ্ধে কেবল কমিউনিস্টরা নন, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষজনও এগিয়ে এসে গড়ে তুলেছেন ''ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এগেন্‌স্ট ডিসঅ্যাপিয়ারেনসেস্‌।'' তুরস্ক এই সংগঠনের মূল কেন্দ্র, যার শাখা ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আছে।

এই সংগঠনের উদ্যোগেই গত ১৬ থেকে ২০ মে তুরস্কের দিয়ার বাকারে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভারত থেকে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহ-সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি যোগ দিয়েছিলেন। মোট ৩০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন, তুরস্কের বাইরে অন্যান্য ২৩টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা ছিলেন। ১৬ মে সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন দিয়ার বাকার শহরের মেয়র। গুমখুন হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে ১৭ মে সকালে দিয়ার বাকারে একটি মিছিল হয়, তাদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ১২০০ বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

গণতন্ত্রের নামে তুরস্কে কীরকম ফ্যাসিস্ট শাসন চলছে — তার একটি নমুনা সম্মেলনেও পাওয়া গিয়েছে। সভা-সমাবেশের ক্ষেত্রে তুরস্কে এমন আইন তৈরি করা হয়েছে যার দ্বারা যেকোন সভা-সমাবেশ এমনকী হলের সম্মেলনেও পুলিশ ঢুকতে, আগাগোড়া উপস্থিত থেকে ছবি তুলে নিতে, বক্তব্য রেকর্ড করে নিতে পারে। আলোচ্য সম্মেলনেও পুলিশ সেই কাজটি করেছে।

১৯ মে তিনটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়, যার আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল (ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন, বন্দী হত্যা এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ।

(খ) যুদ্ধনীতি ও মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অবস্থা।

আটের পাতায় দেখুন

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

শ্রমিক স্বার্থে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দাবি প্রস্তাব পেশ

গত ৩০ মে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। আসন্ন রাজ্য বাজেটে কোথায় কতটুকু ট্যাক্স আরোপ করা হবে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ট্যাক্সবৃদ্ধি করা হবে, কোথায় ছাড় দেওয়া হবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতামত জানার জন্যই এই সভা ডাকা হয়েছিল। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক দেব। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স আরোপ এবং শিল্পপতিদের ট্যাক্স ছাড় দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে সভায় কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, অতীতে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে যে মতামত দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে শ্রমিকস্বার্থের বিপরীতে মালিকদের পক্ষেই কাজ করেছে। কেন আমাদের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করা হল তাও জানানো হয়নি। রাজ্য সরকারের এহেন ভূমিকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ২৭ দফা প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য পেশ করেন। এই প্রস্তাবগুলি দেখিয়ে দেয় অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যের শ্রমিকদের কী চরম সঙ্কটের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।

প্রস্তাবসমূহ ঃ

১। রাজ্য সরকারের দ্বারা পরিচালিত এবং অধিগৃহীত শিল্পসংস্থাগুলির কোনও শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা চলবে না, সংস্থাগুলিকে বন্ধ করা চলবে না এবং ব্যক্তিমালিকের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।

২। বন্ধ কারখানার শ্রমিক, ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিক, ই আর এস বা ভি আর এসের নামে ছাঁটাই শ্রমিক, দীর্ঘ অসুস্থতাজনিত কারণে চাকরি থেকে বাধ্য হয়ে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কারখানা বন্ধ করার ফলে আত্মহত্যা করা শ্রমিকের পরিবার, বা বিনা চিকিৎসায়, খাদ্যের অভাবে মৃত শ্রমিকদের পরিবারগুলির সার্বিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।
(ক) এই পরিবারগুলির জন্য পূর্ণ রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
(খ) বিনামূল্যে চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে।
(গ) বিনামূল্যে এইসব পরিবারের সন্তানসন্ততিদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এর জন্য বিশেষ 'লেবার ওয়েল-ফেয়ার ফান্ড' গঠন করতে হবে। তহবিলের অর্থ যোগান দেবে শিল্পপতিরা, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার।

৩। বর্তমানে কোনও শিল্পের মালিক শ্রমিকদের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করছে না। স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ মালিকরা চটকলে যে কোয়ার্টার করেছিলেন, যার বর্তমান অবস্থা শোচনীয়, সেই শোচনীয় অবস্থায়ও মাত্র দশভাগ শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা আছে। বাকি ৯০ ভাগের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। শহরে বা যেখানে কলকারখানা হচ্ছে সেখানে শ্রমিকদের বাসস্থানের তীব্র সমস্যা।

এদিকে ঘরভাড়া বাবদ শ্রমিকদের দেওয়া হয় বেতনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। কলকারখানার শ্রমিকরা গড়ে বর্তমানে মাসে ১৫০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা বেতন পায়। বর্তমান বাজারদরে ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় ঘরভাড়া পাওয়া যায় না। ঝুপড়ির ভাড়াও এর থেকে বেশি। এই কারণে আমাদের প্রস্তাব (ক) শ্রমিকদের জন্য হাউজিং-এর ব্যবস্থা, (খ) শতকরা ২০ ভাগ ঘরভাড়া দেওয়ার জন্য আইন করা দরকার।

৪। বন্ধ চা-বাগানসহ চা-শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের রেশন, চিকিৎসা, শিক্ষা, জ্বালানি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫। বৃত্তিকরের মাধ্যমে সংগৃহীত টাকা থেকে লকআউট কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে।

৬। সমস্ত বেকারের দায়িত্ব নিয়ে ভাতা দিতে হবে।

৭। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত ভাতা দিতে হবে ও মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করতে হবে।

৮। রাজ্য সরকারের চাপানো পেট্রলের উপর ২৫ শতাংশ ও ডিজেলের উপর ১৭ শতাংশ বিক্রয় কর প্রত্যাহার করতে হবে।

৯। রাজ্য সরকারের চাপানো পেট্রল ও ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১ টাকা সেস প্রত্যাহার করতে হবে।

১০। রেশনের চাল, ফুড ফর ওয়ার্কের চাল ও মিড ডে মিলের চাল রাজ্য সরকারকে ন্যায্য দামে চাষীর কাছ থেকে সরাসরি কিনতে হবে এবং এ জন্য প্রতিটি ব্লকে সরকারি চাল বা ধান ক্রয়কেন্দ্র খুলতে হবে।

১১। বাংলার ১৫ লক্ষ পাটচাষীর কাছ থেকে রাজ্য সরকারকে সরাসরি পাট কিনতে হবে। এজন্য রাজ্য সরকারকে জুট কর্পোরেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বা জে সি ডব্লিউ বি খুলতে হবে। পাটের দর কুইন্ট্যাল প্রতি দু'হাজার টাকা করে দিতে হবে।

১২। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে লগ্নীকারী পুঁজিপতিদের কোন ট্যাক্স ছাড় দেওয়া চলবে না; তাদের জন্য সস্তা দরে বিদ্যুৎ, জমি, জলের ব্যবস্থা করা চলবে না।

১৩। নতুন বিনিয়োগের নামে লগ্নীকারীদের যে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে।

১৪। গরিবের উপর বিদ্যুতে দামের বোঝা চাপিয়ে শিল্পপতিদের দাম কমানো চলবে না।

১৫। বন্ধ কারখানার জমিতে কোনমতেই হাউজিং কমপ্লেক্স করতে দেওয়া চলবে না এবং শ্রমনির্ভর শিল্পই গড়ে তুলতে হবে।

১৬। পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৭। চাষীদের বছরে একর প্রতি ৩০০ লিটার করমুক্ত ডিজেল দিতে হবে। এজন্য কৃষক কার্ড চালু করতে হবে।

১৮। (ক) কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। বর্তমানে ৫ এইচ.পি. মোটর মালিকদের ক্ষেত্রে ৮,৮৫০ টাকার (বাৎসরিক) জায়গায় আগের ৫,৪৫০ টাকা চালু করতে হবে।
(খ) ১০০ টাকা কানেকশন-ডিসকানেকশন চার্জ বাতিল করতে হবে।
(গ) সাধারণ মানুষ ও বিদ্যুৎচাষীদের ক্ষেত্রে লেট পেমেন্ট সারচার্জ প্রথা বাতিল করতে হবে।

১৯। শিল্পায়নের নামে রাজ্য সরকারের কৃষক উচ্ছেদ নীতি বন্ধ করতে হবে।

২০। লক্ষ লক্ষ অমীমাংসিত বিক্রয়কর মামলা দ্রুত সমাধান করে সরকারি কোষাগারে আয় বাড়াতে হবে।

২১। জমির রেজিস্ট্রেশন ফি ৮ শতাংশের জায়গায় ৩ শতাংশ করতে হবে।

২২। মিউটেশন ফি একর প্রতি ১০০ টাকার জায়গায় পূর্বের মত দরখাস্ত প্রতি ৭৫ পয়সা করতে হবে।

২৩। গ্রামে খাজনা একর প্রতি ২৩ টাকার জায়গায় আগের মত ৯ টাকা করতে হবে।

২৪। মিউনিসিপ্যালিটিতে জমির খাজনা শতকে ১৮ টাকার জায়গায় আগের মত শতকে ৯ পয়সা করতে হবে।

২৫। পঞ্চায়েতের উপধারা করে হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল ইত্যাদিতে ট্যাক্স বসানো চলবে না।

২৬। প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারগুলিকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সুচিকিৎসা পাওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

২৭। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

মুর্শিদাবাদ

গরিব দরদি বামফ্রন্ট ছাত্রদের ঘাড় ভেঙে ফি আদায় করছে

বামফ্রন্ট সরকারের সবুজ সঙ্কেত পেয়েই পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলিতে বেআইনি ডোনেশন ও ফি আদায়ের জুলুমবাজি শুরু হয়েছে। সরকার নির্ধারিত ফি যেখানে ৬৩ টাকা, সেখানে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত ফি বাড়িয়ে চলেছে। কোথাও দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ এমনকী ১৫ গুণ পর্যন্ত ফি বাড়ানো হয়েছে। জেলার গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপর এই ফি-বৃদ্ধির অত্যাচার তাদের সামনে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা রাখেনি। তারা 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি' গঠন করে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। গরিব সাধারণ মানুষের আন্দোলন ভাঙতে ওস্তাদ সিপিএম সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশবাহিনীও পাঠিয়েছে। কিন্তু ছাত্র-অভিভাবকদের সম্মিলিত আন্দোলন স্কুল কর্তৃপক্ষকে বাড়তি ফি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে। এই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জেলাজুড়েই আন্দোলন চলছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার মালডোবা স্কুল ও রাণীনগর স্কুলে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ফি কমাতে বাধ্য হয়েছে। তেঘরি খাসরা ভাবকি স্কুলে আন্দোলন চলছে। ডোমকলের টিকরবাড়িয়া স্কুলে ১৮০ টাকা ফি নেওয়ার প্রতিবাদে কমরেডস্ হামিদুল ইসলাম ও আইনাল হকের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ৮৫ টাকা ফি নিয়ে ছাত্রভর্তি করতে বাধ্য হন। ধুলাউড়ি স্কুলে ফি ১৫০ টাকা থেকে কমে ৬৩ টাকা হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড রফিকুল ইসলাম। ভগবানগোলা গার্লস ও বয়েজ স্কুলে ফি বাড়িয়ে যথাক্রমে ২২৫ ও ২৮৪ টাকা করা হয়েছিল। আন্দোলনের চাপে তা কমে হয় যথাক্রমে ১২৫ ও ১১৩ টাকা। এই আন্দোলনে কমরেডস্ আব্দুল মাবুদ ও ওহিরুজ্জামান নেতৃত্ব দেন। ইসলামপুর থানার ছয়ঘরি আলিয়া মাদ্রাসাতেও বাধ্যতামূলক ডোনেশন আদায় বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। সূতী থানার মানিকপুর স্কুলে ফি ১১০ টাকা থেকে কমে ৬৩ টাকা হয়েছে। এখানে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড লুৎফুল হক। ছাবঘাটি কে ডি বিদ্যালয়ে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে শিক্ষা বাঁচাও কমিটির সম্পাদক রামচন্দ্র দাস ও সভাপতি মৈনুদ্দিন খাঁ-র নেতৃত্বে চারশত অভিভাবক ডেপুটেশন দিতে গেলে প্রধান শিক্ষক পুলিশ ডাকেন। পুলিশের উপস্থিতি আন্দোলন-কারীদের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। তিন দিন ভর্তি বন্ধ থাকে। ২৩ মে আরও ব্যাপক সংখ্যায় প্রায় এক হাজার ছাত্র-অভিভাবক স্কুলে সমবেত হলে প্রধান শিক্ষক শেষপর্যন্ত ৬৩ টাকা ফিতেই ভর্তির দাবি মেনে নেন। ফি বাড়িয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে ছাত্রদের বঞ্চিত করার সিপিএম সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা ধিক্কার জানান। অভিভাবকরা স্কুলে যৌনশিক্ষা চালুরও বিরুদ্ধতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্কুলে যৌনশিক্ষা নয়, মানুষ তৈরির, চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে হবে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাণীনগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক যৌনশিক্ষা চালু করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৫৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পাতায় সংরক্ষণ ইস্যুতে আন্দোলনের ছবির ক্যাপশনে উল্লেখিত তারিখ ২৫ মে'র পরিবর্তে ২৫ মার্চ ছাপা হয়েছে।

কাঁকিনাড়া ও নফরচাঁদ জুটমিল বিনাশর্তে খোলা ও প্রাপ্য মজুরির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

কাঁকিনাড়া জুটমিল এবং নফরচাঁদ জুটমিল বিনাশর্তে খোলা এবং শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরির দাবিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অনুমোদিত 'বেঙ্গল জুটমিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে'র উদ্যোগে ব্যারাকপুর ডেপুটি লেবার কমিশনারের দপ্তর ও মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভের চাপে ২৯ মে কাঁকিনাড়া জুটমিল এবং ৩০ মে নফরচাঁদ জুটমিল খোলার জন্য শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়। কাঁকিনাড়া জুটমিলের শ্রমিকদের অর্জিত মজুরিও ২৬ মে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

উল্লেখ্য যে, ভাটপাড়া নির্বাচন শেষ হতে না হতেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে গত ১৯ মে নফরচাঁদ জুটমিল ও ২০ মে কাঁকিনাড়া জুটমিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষিত হয়। বাস্তবে কম টাকায় শ্রমিক নিয়োগের অন্যায় শর্ত মেনে 'শ্রমিকরা উৎপাদন দিচ্ছে না' এই অজুহাতে দুটি জুটমিলই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে সাড়ে আট হাজার শ্রমিকের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিকরা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে রেললাইন ও বাসরাস্তা অবরোধ করে। বেঙ্গল জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন মনে করে, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, দিশাহীন আন্দোলনের দ্বারা পরিস্থিতির পরিবর্তন হবেনা। সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের পেছনে মালিক ও দালাল ইউনিয়নের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ শ্রমিকদের ভাল করে বুঝতে হবে। এদিনের এই বিক্ষোভ অবস্থানে নেতৃত্ব দেন বেঙ্গল জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক কমরেড অমল সেন এবং এবং কাঁকিনাড়া ইউনিটের সম্পাদক কমরেড মানস ভট্টাচার্য।

প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে

কুলতলিতে জয়ের ইতিহাস গড়ল জনগণ

এবার নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই সিপিএম ঘোষণা করেছিল কুলতলিতে তারাই জিতবে। এ সম্পর্কে তারা এতদূর সুনিশ্চিত ছিল যে, ভোটগণনা কেন্দ্রে বিজয় মিছিলের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েই তারা হাজির ছিল। কিন্তু অকল্পনীয় প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এস ইউ সি আই প্রার্থীকে আবারও জিতিয়ে এনেছেন কুলতলির সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে টানা দশবার। এ জয় মোটেই সহজ ছিল না। সংগঠনের আদর্শগত গণভিত্তি খুব সুদৃঢ় না হলে এবং গরিব চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের শ্রেণীচেতনা খুব প্রখর না হলে এ জয় কোনমতেই সম্ভব হত না। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর সিপিএম তাদের এই লজ্জাজনক পরাজয়ের ব্যর্থতা ঢাকতে এখন প্রচার করছে যে, এবার তারাই জিততো, কিন্তু কংগ্রেস ও তৃণমূল নিজেদের ভোট এস ইউ সি আই প্রার্থীকে দেওয়ায় নাকি সিপিএম হেরে গিয়েছে। তাদের দলের একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা নির্বাচনের পর এক টিভি সাক্ষাৎকারেও একই কথা বলেছেন। গোয়েবলসের যথার্থ উত্তরসূরীই বটে?

আমরা সিপিএম নেতাদের অনুরোধ করব এতদঞ্চলে তাঁরা তাদের দলের উত্থানের এবং সংগঠন বিস্তারের ইতিহাসটা স্মরণ করুন। কবে থেকে এবং কাদের সমর্থনে তাদের সংগঠন এখানে গড়ে উঠেছে? তা কি গরিব চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে, অথবা আদর্শগত প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে? নাকি, কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস, যাদের থেকেই কেউ কেউ পরে তৃণমূল হয়েছে, তারাই এতদঞ্চলে সিপিএমের সংগঠনের মূল ভিত্তি ? ইতিহাস কী বলে?

এখানকার ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরাই বলবেন যে, সিপিএম ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস, জোতদার ও কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূরা সদলবলে সিপিএমে যোগ দেওয়াতেই এখানে সিপিএমের উত্থান সম্ভব হয়েছে। এই দলবদল যতদিন না হয়েছে ততদিন কুলতলি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিবারই সিপিএমের জামানত জব্দ হয়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই এস ইউ সি আইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস —সিপিএম নয়।

১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিএমের জন্ম। কুলতলি বিধানসভায় তারা প্রথম প্রার্থী দেয় ১৯৭১ সালে। তাদের প্রাপ্ত ভোট ছিল ১৯৭১-এ ৭,৭২৩; ১৯৭৭-এ ৩,৮২৬; ১৯৮২-তে ১১,৯৫০ এবং ১৯৮৭ তে ১১,০৩৮। ঠিক পরের নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৯১ সালে পটপরিবর্তন ঘটে; এতকাল সিপিএমের জামানত জব্দ হত, এবার হল কংগ্রেসের। এস ইউ সি আইয়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কংগ্রেসের জায়গায় এল সিপিএম। কংগ্রেস পায় আগের ৩৩,৯৪৯ ভোটের বদলে ১১,৮৩৯ ভোট এবং সিপিএম পায় আগের ১১,০৩৮ ভোটের বদলে ৩৩,৭০২ ভোট। অর্থাৎ কংগ্রেস ও সিপিএম যেন নিজেদের ভোটের অঙ্কটা নাটকীয়ভাবে বিনিময় করে নিল। এরপর ক্রমাগত কংগ্রেসের ভোট কমেছে এবং সিপিএমের ভোট বেড়েছে। সাম্প্রতিক ২০০৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট মাত্র তিন হাজারে এসে ঠেকেছে। তাহলে এতদঞ্চলে কংগ্রেসের ভোটটা পাচ্ছে কারা! ১৯৮৭-র পর ১৯৯১ সালে এমন নাটকীয় পরিবর্তন কী করে হল? কংগ্রেসের সমস্ত ভোট সিপিএমের বাক্সে গেল কী করে?

ইতিহাস বলছে, অতীতে একসময় অবিভক্ত সিপিআই, যা পরবর্তীকালে নানাভাগে বিভক্ত হয়েছে, কৃষক আন্দোলন গড়ে তুললেও সুন্দরবনের এই এলাকাগুলিতে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। জয়নগর-কুলতলি সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় কংগ্রেস ও জোতদারবিরোধী কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এস ইউ সি আই। তাছাড়া, এস ইউ সি আই কুলতলিতে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সিপিআই-এর গড়ে তোলা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য ছিল। জোতদারের বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ এবং ভাগচাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এস ইউ সি আই ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপূরকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এজন্য কৃষক খেতমজুরদের মধ্যে সর্বহারা বিপ্লবী শ্রেণীচেতনা গড়ে তোলার উপরই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথম থেকেই লড়াই ও সংগ্রামের পাশাপাশি চাষী-মজুরদের মধ্যে অসংখ্য রাজনৈতিক ক্লাস ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে — যার অনেকগুলি পরিচালনা করেছেন স্বয়ং কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করে এই ক্লাসগুলির মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জটিল তত্ত্বগুলো অত্যন্ত সহজ ভাষায় তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। সাথে সাথে সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভবের ইতিহাস এবং তারপর থেকে মানুষের সমাজ শ্রেণীসংগ্রামের পথ বেয়ে পরিবর্তিত হতে হতে আজ তার চরিত্র কী রূপ নিয়েছে এবং সেখানে মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী তা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে তাদের শ্রেণীচেতনাকে প্রখর করে গড়ে তুলেছেন। তিনি তাদের শিখিয়েছেন, জমির লড়াই এবং বর্গাদারের অধিকার কায়েমের মধ্য দিয়েই তাদের লড়াই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এর দ্বারা তাদের জীবনের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। শোষণ থেকে মুক্তি ঘটবে না। সেজন্য শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। এর সাথে তিনি তাদের দিয়েছেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা, দিয়েছেন সর্বহারাশ্রেণীর উন্নত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সুর, যা এতদঞ্চলের চাষীদের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে — যাকে ধ্বংস করতে কংগ্রেস ও জোতদারশ্রেণী ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন সিপিএম ও কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীরা বারে বারে সর্বপ্রকার আক্রমণ চালিয়েও ধ্বংস করতে পারছে না।

সুন্দরবনের অন্যান্য এলাকার মত কুলতলির গরিব মানুষও একদা বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অমানুষিক পরিশ্রমে জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করেছিল, বুনো জমিকে এনেছিল মানুষের বশে। অনাবাদী জমিকে করেছিল চাষযোগ্য। আর লাঠি, বন্দুক, ক্রিমিনাল ও সরকারি আইনের জোরে জমির মালিক হয়ে বসেছিল জমিদাররা। ফলে চাষীরা ছিল কার্যত ভূমিদাস। তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। জমিদারি শোষণ-লুণ্ঠন-অত্যাচার ছিল চরমে। অমানুষিক পরিশ্রম করে মাঠে ফসল ফলাতো গরিব মানুষ, কিন্তু জমিদারি দেনা সুদে-আসলে মেটাতে তাদের উৎপাদিত প্রায় সমস্ত ফসল উঠত জমিদারের গোলায়। অনাহার-অর্ধাহারে তাদের দিন কাটতো। গরিব মানুষকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে এই এলাকায় কুখ্যাত জমিদারি অত্যাচারের নৃশংসতম নজির হয়ে আছে জমিদার দেবী রায়চৌধুরীর অবর্ণনীয় অত্যাচার। এসবকেই বিধিলিপি মেনে কুলতলির মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে দিন গুজরান করত। সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অত্যাচারিত অসহায় গরিব চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষকে সচেতন-সংঘবদ্ধ করে মানুষের মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছিল, মনোবল জুগিয়েছিল এস ইউ সি আই, সেই ৫০-এর দশকে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এই এলাকায় ঘটেছিল কৃষক জাগরণ। কৃষকদের বুকের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল তীব্র শ্রেণীচেতনা। ঘটেছিল জোতদারবিরোধী কৃষক ও খেতমজুরদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন। তারই ফলে এতদঞ্চলে ঘটে গিয়েছে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম; একদিকে চরম শোষিত নিপীড়িত চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষ ও তাদের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই, অপরদিকে অর্থ ও শক্তিতে বলীয়ান জোতদার-মহাজন-প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও তাদের সমর্থকগোষ্ঠী এবং এদের নেতৃত্বে কংগ্রেস। এর বাইরে তৃতীয় কোন পক্ষ বা দলের কোন অস্তিত্বই এতদঞ্চলে ছিল না। বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে ঘটেছে তারই প্রতিফলন। কুলতলি কেন্দ্রের জন্মলগ্ন থেকে, ১৯৭২ সালের সর্বাত্মক কংগ্রেসী রিগিং ছাড়া গরিব চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের বিপুল সমর্থনে প্রতিটি নির্বাচনেই কংগ্রেসকে পরাস্ত করে এস ইউ সি আই জয়লাভ করেছে।

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশদপ্তর সিপিএমের অধীনে থাকার সুযোগে ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে সিপিএম রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে শরিক দলগুলির সংগঠন ভাঙতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এলাকায় এলাকায় তারা গরিব চাষী-মজুরদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে তার সুযোগে নিজেদের সংগঠন গড়ার ও সংগঠনবৃদ্ধির কৌশল নেয় এবং এই সময়েই গ্রামে-গঞ্জে তারা জোতদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। কুলতলিতেও তারা এই চেষ্টা চালায়। এই সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তারা প্রথম কুলতলি কেন্দ্রে দাঁড়ায়। ১৯৭৭ সালে তারা রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পর থেকে গ্রামীণ জোতদার, বড় বড় ব্যবসাদার এবং কায়েমী স্বার্থের ধারকরা বুঝে যায় যে, কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে লাভ নেই, নিজেদের হৃতস্বার্থ পুনরুদ্ধার করতে হলে সিপিএমকেই আশ্রয় করতে হবে, যাতে পুলিশ-প্রশাসনের মদতপুষ্ট হয়ে তারা কুলতলিতে এস ইউ সি আইকে ধ্বংস করতে পারে, চাষী-মজুরের জমাট সংঘবদ্ধতায় ভাঙন ধরাতে পারে। ধীরে ধীরে চলে এই প্রক্রিয়া। এলাকার ক্রিমিনাল বাহিনী এবং জলদস্যুরাও কংগ্রেসের শিবির ত্যাগ করে সিপিএমের দিকে পা বাড়ায়। ১৯৮৯ সালে কুলতলির কংগ্রেস নেতারা, জোতদাররা, বড় বড় ব্যবসাদার ও কায়েমি স্বার্থবাদীরা সদলবলে যোগ দেয় সিপিএমে। এই পালাবদলের ক্ষেত্রে যে দু'জন নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা হলেন সিপিএমের রাজ্য নেতা কান্তি গাঙ্গুলি এবং কুলতলি থানার তৎকালীন ওসি। ফলে কংগ্রেস হয়ে যায় হীনবল। '৮৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের জামানত জব্দ হওয়া এবং সিপিএমের বাড়বাড়ন্তের এই হল ইতিহাস। নাহলে সিপিএম কুলতলিতে কৃষক আন্দোলন করল কবে? বরং কৃষক হত্যাকারী লুঠেরা জোতদারদের লোকজন, বৃহৎ ব্যবসাদার এবং কংগ্রেস নেতারাই তো কুলতলির সিপিএম। তাই সিপিএম যখন বলে যে, কুলতলিতে কংগ্রেস ও তৃণমূল তাদের ভোট এস ইউ সি আইকে দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছে তখন বোঝা যায়, মিথ্যাচার এদের কী ধরনের পেশায় পরিণত হয়েছে!

এস ইউ সি আই প্রার্থীরা এবার নিয়ে দশবার জিতলেন কুলতলিতে। কিন্তু কোন্ ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এই জয় অর্জিত হয়েছে তা জানলে বোঝা যাবে এটা ছিল বাস্তবে একটা অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধজয়ের মতই দুর্গরক্ষার লড়াই। কুলতলিতে সিপিএম তাদের কাজ শুরু করেছে কংগ্রেসের চেয়েও সুনিপুণভাবে, জোতদাররা বা কংগ্রেস যা ভাবতেও পারত না। কংগ্রেসকে লোকে জানত বড়লোকদের দল হিসাবে। গরিবের ঐক্য কংগ্রেস ভাঙতে পারেনি। কিন্তু সিপিএম হাতে লাল ঝাণ্ডা ও মুখে গরিবের পার্টির স্লোগান দিতে দিতেই গরিবে গরিবে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ লাগিয়ে যাচ্ছে। আগে গরিবে গরিবে বিরোধ হলে মূলত গরিবের দলের নেতৃত্বে বৈঠক করে তারা নিজেরাই মীমাংসা করে নিত। আর সিপিএম এখন কী করছে? যে অন্যায় করছে তারই পক্ষ অবলম্বন করে পুলিশ দিয়ে তাকেই মদত দিচ্ছে, এমনকী হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিয়ে অপরপক্ষকে হত্যায় উৎসাহিত করছে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করাচ্ছে। আর, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে গরিব মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা ও সুবিধাবাদের চর্চা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে তারা গরিব চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত জনগণের জোতদার-কায়েমিস্বার্থ বিরোধী সংগ্রামকে হীনবল করার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে অঞ্চলে অঞ্চলে তারা কংগ্রেসের চেয়ে আরও নৃশংসতার সঙ্গে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় চালিয়ে যাচ্ছে খুন-সন্ত্রাস-ধর্ষণ-লুঠ-ডাকাতি-ঘর জ্বালানো ইত্যাদি। জোতদারবিরোধী রক্তঝরা আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে যারা সাহস জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে, এলাকায় এলাকায় জনগণের আশা-ভরসার স্থল সেই এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে তারা ভাড়াটে ঘাতক দিয়ে হত্যা করে চলেছে, যাতে জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও নেতৃত্বহীন হয়ে উপায়হীন অবস্থায় বাঁচবার করুণ আবেদন নিয়ে সিপিএম নেতাদের পায়ের উপর আছড়ে পড়তে বাধ্য হয়। সেজন্য অন্য অনেকের সাথে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম প্রবীণ নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় কমরেড আমির আলি হালদারকেও তারা প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, কৃষক আন্দোলনের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় তরুণ নেতা কমরেড অশোক হালদারকে পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে গুলি করে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। মৈপীঠের ৭ জন কর্মীকে হত্যা করে উত্তাল নদীর স্রোতে ফেলে দিয়েছে, যাদের মাত্র একজনের ছাড়া আর কারো দেহের হদিস মেলেনি। গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী অঞ্চলে ১৩ বছরের এক কিশোর ছাত্র সহ ৫ জনকে তারা পৈশাচিক বর্বরতায় হত্যা করেছে। কুলতলিতে শহিদ হয়েছেন এমনই ৮০ জন। শাস্তি হওয়া দূরের কথা, তাদের প্রশ্রয়ে সেই সব খুনিরা বুক ফুলিয়ে এলাকায় এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে গণআন্দোলনের যেসব নেতা-কর্মী ওদের ঘাতকবাহিনীর হাত এড়িয়ে আজও বেঁচে আছেন, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সিপিএম তাদের জেলে পাঠাচ্ছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করাচ্ছে। কুলতলি বিধানসভার জন্মলগ্ন থেকে ৯ বারের বিজয়ী বিধায়ক জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকেও তারা সুপরিকল্পিতভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করিয়েছে। এস ইউ সি আই করার অপরাধে অসংখ্য চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের চাষের জমি সিপিএম কেড়ে নিয়েছে অথবা জোর করে লিখিয়ে নিয়েছে, জমির ধান-ঘরবাড়ি-দোকানপাট লুঠ করেছে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, হাজার হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে, পুকুরে-খাবারে বিষ ঢেলে দিয়েছে, মা-বোনেদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে, ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে অনেককে পঙ্গু করে দিয়েছে, এলাকাছাড়া করেছে। অন্যদেরও এস ইউ সি আই করলে একই পরিণতি হবে বলে শাসাচ্ছে। প্রতিনিয়ত এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এস ইউ সি আইকে এখানে সংগঠন রক্ষা করতে হচ্ছে। কী ভয়াবহ পরিস্থিতি! অন্যদিকে পুলিশ-প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি মৈপীঠ, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি এলাকায় প্রকাশ্যে যে ভাষণ দিয়ে বেড়িয়েছেন তা শুনলে মনে হবে — এ বুঝি কোন দস্যু সর্দারের হুঙ্কার! তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'রতনে রতন চেনে, শুয়োরে চেনে কচু, আর কান্তি

চারের পাতায় দেখুন

কুলতলির এই জয় ঐতিহাসিক

তিনের পাতার পর

গাঙ্গুলি চেনে এস ইউ সি-কে; এস ইউ সি খতমের রাস্তা আমি জানি। এখন সবেমাত্র ছোঁ মেরেছি, এবার টানবো নখের আঁচড়।' এই হচ্ছে সিপিএম নেতার বক্তৃতা — যিনি টিভিতে, সংবাদমাধ্যমে অহরহ 'শান্তি চাই, শান্তি চাই' বলে মন্ত্র আওড়ান। এই নেতার পরিকল্পনায় কলকাতায় তার প্রভাবিত এলাকা থেকে কুখ্যাত ক্রিমিনালদের নিয়ে গিয়ে এবং স্থানীয় ও আশপাশের এলাকার জলদস্যু ও অন্যান্য ক্রিমিনালদের জড়ো করে দীর্ঘকাল ধরে চলছে এস ইউ সি আই নিধন অপারেশন। এই মন্ত্রী এলাকার ক্রিমিনালদের লিস্ট নিয়ে তাদের ডেকে পাঠিয়ে মিটিং করেছেন; এলাকা ছেড়ে পালানো ক্রিমিনালদের নিজ এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। সিপিএম এসব কাদের স্বার্থে করছে? চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের স্বার্থে? নাকি জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের হীন স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে?

আগে কংগ্রেসী জোতদার এবং ১৯৮৯ থেকে সিপিএমের ঘাতকবাহিনী ও পুলিশের হাতে যাঁরা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, কুলতলির সেইসব বীর সন্তানদের একটি তালিকা এই প্রতিবেদনের সাথে পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরা হল। এর বাইরেও হয়ত থেকে গেছে আরও নাম। এছাড়াও কত মানুষ পঙ্গু, কত মা-বোন ধর্ষিতা, কত বাড়ি লুণ্ঠিত, কত বাড়ি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত, কত মানুষ সর্বস্বান্ত — তার তালিকা লিখে শেষ করা যাবে না। তবু সিপিএম ও কায়েমি স্বার্থের কাছে কুলতলির চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত মাথা নত করেননি। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে সিপিএম মৈপীঠের ১৬ হাজার ভোটারকে ভোট দিতে না দিয়ে প্রায় সবটাই ছাপ্পা মেরে নিজেদের পক্ষে নিয়েছিল। ফলে জিতে যাবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেবারও ভোটগণনা কেন্দ্রে তারা আবির ও ব্যান্ডপার্টি নিয়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু এত করেও তারা গরিব সাধারণ মানুষের উঁচু মাথা নুইয়ে দিতে পারেনি, বরং মাথা নিচু করে সিপিএম নেতাদেরই ফিরে যেতে হয়েছিল।

এবারের নির্বাচনে কুলতলিতে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা ছিল খুবই কম। বারবার কমিশনের কাছে প্রশাসনিক সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায়নি। প্রকাশ্যে বুথদখল ও ছাপ্পা ভোট ছাড়া রিগিং-এর অন্যান্য সমস্ত কৌশলগুলি সিপিএম কুলতলিতে কাজে লাগিয়েছিল। প্রথমত, ভোটার লিস্ট তৈরিতে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল সিপিএম। বহু সংখ্যক এস ইউ সি আই সমর্থকের নাম ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে দফায় দফায় বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বহু ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। এস ইউ সি আই সমর্থক বহু নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদনপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী ভোটের দিন পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে বুথে গিয়েও বহু ভোটার ভোট দিতে পারেননি; শেষমুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের বকলমে সিপিএম বহু নাম কেটে বাদ দিয়েছে। যেসব মানুষ দূর-দূরান্তে এমনকী ভিন্ রাজ্যে রুজি-রোজগারের জন্য থাকেন, এমন অনেকেই সচিত্র পরিচয়পত্র ঠিক সময় তৈরি করাতে পারেননি। এমন ভোটারদের জন্য বিডিও অফিস থেকে বিশেষ স্লিপ ইস্যু করা হবে বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করলেও বাস্তবে সেই স্লিপগুলি সমস্তই সিপিএম হস্তগত করে। ফলে ন্যায্য ভোটাররা ভোট দিতে পারেননি, তার জায়গায় সিপিএম ভুয়ো ভোটারদের ন্যায্য ভোটার বানিয়ে ঐ স্লিপের সাহায্যে ভোট করিয়েছে। অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ছিল মাত্র একজন কি দুজন নিরাপত্তাকর্মী, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল তাদের কাজ। প্রায় সব বুথে পোলিং স্টাফ হিসেবে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা সিপিএমের পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। একটি বুথে এস ইউ সি আই-এর পোলিং এজেন্টকে সিপিএম বের করে দিয়েছে, পোলিং অফিসার এবং নিরাপত্তাকর্মীরা ছিল নীরব।

শুধু তাই নয়, নির্বাচনী প্রচারের প্রশ্নেও প্রথম থেকেই এস ইউ সি আইকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গেই সিপিএম তাদের দেওয়াল লিখন সেরে ফেলে। তারপরই বহু বছর চেপে রাখা দেওয়াল লিখন নিষিদ্ধকারী কালা আইনটি তারা তুলে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনের হাতে। ফলে, দেওয়াল লিখনই যাদের প্রচারের প্রধান অবলম্বন, সেই এস ইউ সি আইয়ের প্রচারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে সংবাদপত্র ও টিভি সহ প্রায় সমস্ত সংবাদমাধ্যম একনাগাড়ে 'সিপিএম জিতবেই' বলে দিনরাত নির্লজ্জ প্রচার চালিয়েছে; পুঁজিপতিশ্রেণীও সরাসরি সিপিএমের পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। তৃণমূল ও কংগ্রেসের বক্তব্যও সংবাদমাধ্যমে এসেছে। এইসব দলগুলির প্রতীকও নির্দিষ্ট। কিন্তু নির্বাচনে এস ইউ সি আই যে লড়ছে — সংবাদমাধ্যমে তার কোন নামগন্ধও ছিল না এবং এস ইউ সি আই প্রার্থীরা প্রতীক পেয়েছেন নির্বাচনের মাত্র সামান্য কয়েকদিন আগে। পরীক্ষার সময় বলে মাইকপ্রচারও নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় এস ইউ সি আইয়ের প্রচার করবার সুযোগও ছিল না। ভোটের মাত্র ১০/১২ দিন আগে প্রচারের অনুমতি মেলে। 'ভোটের পর দেখে নেব' বলে পাড়ায় পাড়ায় সিপিএমের হুমকি ছিল মারাত্মক এবং সেই দেখে নেওয়া যে কী ভয়ঙ্কর তা কুলতলির মানুষ তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় জানেন। এর সঙ্গে ছিল গরিব মানুষের ভোট কেনার জন্য কোটি কোটি টাকার স্রোত। তাছাড়া, একের পর এক হত্যা, মিথ্যা মামলায় অনেকে জেলে বন্দী এবং আরও অনেকে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় আত্মগোপনে থাকার কারণে বহু এলাকাতেই অভিজ্ঞ নেতা-কর্মী নেই। এই চরম সঙ্কটমুহূর্তে এসেছে এবারের বিধানসভা নির্বাচন। এই সমস্ত প্রস্তুতি ও অঙ্কের ভিত্তিতে সিপিএম তাদের জয় সম্পর্কে এত নিশ্চিত ছিল যে, তাদের রাজ্যদপ্তর আলিমুদ্দিন স্ট্রীট কুলতলি দখলের কথা ঘোষণা করেই দিয়েছিল। ওদের লোকাল কমিটি বলেছিল — কুলতলি দখল হয়ে গেছে, শুধু গণনাটুকুই বাকি। অঞ্চলে অঞ্চলে সিপিএম নেতারা আবির কিনে রেখে বিজয় উৎসবের অপেক্ষা করছিল। সেকারণে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও সংগ্রামী জনগণ একরাশ উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়েছিলেন এই কেন্দ্রটির দিকে। নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায়-রাতে তাঁরা রাজ্য দপ্তরে ফোন করে বারে বারে জানতে চেয়েছেন, কুলতলি এবার রক্ষা করতে পারবেন তো? রাজ্যের অন্যান্য জেলায় সিপিএমের বহু কর্মী-সমর্থকও প্রাণভরা দরদ নিয়ে ফোন করেছেন, বলেছেন — এখন ভীষণ বিপদের সময় আপনাদের; কুলতলিতে প্রবোধবাবু নেই, নতুন প্রার্থী জিতবে তো? তাঁদেরও আকাঙ্ক্ষা — তাঁদের নেতাদের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে এস ইউ সি আই যেন কুলতলিতে জেতে।

বোঝা যায়, সিপিএমের সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা কী গভীর ছিল। কিন্তু দেখা গেল, সমস্ত প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে কুলতলির গরিব চাষী-মধ্যচাষী-খেতমজুর তথা সাধারণ মানুষ সিপিএম নেতৃত্বের সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন। অভিজ্ঞ নেতা-কর্মী-সংগঠক নেই, সেই স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে অনভিজ্ঞ তরুণের দল, যুবকের দল। এলাকায় এলাকায় পুরুষকর্মীরা নেই, সাংসারিক দায়-দায়িত্বকে গৌণ করে দলে দলে এগিয়ে এসেছেন মা-বোনেরা, সিপিএম এবং ক্রিমিনালবাহিনীর হুমকি উপেক্ষা করে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে ভোট করিয়েছেন। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে যে সব গরিব মানুষ কুলতলির বাইরে এমনকী রাজ্যের বাইরে কাজ করেন, তাঁরাও রুজি-রোজগার বন্ধ রেখে ছুটে এসেছেন, দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দিনের পর দিন অনেকের খাওয়া জোটেনি, পরিবার অনাহারে থেকেছে, কিন্তু দায়িত্ব ত্যাগ করেননি। অভিজ্ঞ নেতা-কর্মীহীন কুলতলিতে এঁরাই নেতা-কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছেন। যেভাবে হোক দুর্গ রক্ষা করতে হবে, গরিবের পার্টিকে রক্ষা করতে হবে — এই ছিল দৃঢ়পণ। অবশেষে গরিব-মেহনতি মানুষ জিতেছেন, সিপিএমের সুখস্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দিয়েছেন। এইসব মানুষের অক্লান্ত লড়াই ছাড়া এবারের নির্বাচনে জেতা সহজ ছিল না।

এসব সত্ত্বেও কুলতলির মানুষ এবার যে হারে দলে দলে এস ইউ সি আইকে ভোট দিয়েছেন, ভোটের ফলে তার প্রতিফলন না দেখে তাঁরা বিস্মিত। তাঁদের প্রশ্ন — অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সাহসের সঙ্গে দলে দলে তাঁরা যেভাবে পার্টিকে ভোট দিলেন সেই পরিমাণ ভোট ভোটযন্ত্রের গণনায় মিলল না কেন? তাঁদের এত ভোট গেল কোথায়? সিপিএমের পক্ষে এত ভোট এল কোন্ যাদুবলে? তবে কি ভোটের ইলেকট্রনিক মেশিনের কোন কারচুপি আছে? কুলতলির মানুষের স্থির বিশ্বাস, কারচুপি যদি না ঘটে থাকে তবে তাঁদের দেওয়া এত বিপুল ভোটের হদিস মিলছে না কেন? বোঝা যায়, হিসাব করে সিপিএম যে পরিমাণ কারচুপির বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, কুলতলির মানুষের বিপুল ভোট সেই হিসাবকেও ছাপিয়ে গিয়েছে বলেই এস ইউ সি আই জিততে পেরেছে। নাহলে এই জয় সম্ভব ছিল না। সেকারণে কুলতলির জনগণের এই জয় ঐতিহাসিক।

এই নির্বাচনে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল, কুলতলির সাধারণ মানুষ সমস্ত অত্যাচার, হুমকি, ধারাবাহিক রিগিং-কারচুপিকে পরাস্ত করে যেভাবে বুক দিয়ে আগলে পার্টিকে রক্ষা করে চলেছেন — তা এককথায় নজিরবিহীন। মনে রাখতে হবে, মানুষের মধ্যে এই তীব্র শ্রেণীচেতনা, সিপিএমের মত শক্তিশালী এবং একটি দুষ্ট সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তির মোকাবিলা করবার মত এমন দলগত সংহতি, এমন সুদৃঢ় আদর্শবোধ গড়ে তোলা কোন বুর্জোয়া দলের কাছে আশা করা যায় না, এ জিনিস তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী দলই পারে এ জিনিস গড়ে তুলতে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও শ্রেণীচেতনা এখানকার মানুষের বুকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যেভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে, হাজার নৃশংস অত্যাচার দিয়েও যাকে ধ্বংস করা যাচ্ছে না; তা দেখে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মহল আতঙ্কিত, সেই সঙ্গে সিপিএম নেতারাও চিন্তিত, বিস্মিত। কুলতলি শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নিরন্তর প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। কুলতলির সংগ্রামী জনগণ আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কেবলমাত্র কুলতলি বিধানসভা এলাকাতেই ঘাতকবাহিনীর আক্রমণে এস ইউ সি আই-এর ৮০ জন নেতা-কর্মী-সংগঠক শহীদ হয়েছেন

(তালিকা অসম্পূর্ণ)

দেউলবাড়ী ঃ কমরেডস্ সুধীর হালদার, ভূধর নস্কর, নূরউদ্দিন মোল্লা, জাকির খাঁ, আমিনুদ্দিন লস্কর।

গোপালগঞ্জ ঃ কমরেডস্ বাঁটুল হালদার, পুতুল ঘোষ, রতিকান্ত হালদার, রহিমবক্স সরদার, দিলীপ সরদার।

বেলে-দুর্গানগর ঃ কমরেডস্ বিদ্যাধর হালদার, রাধাকান্ত প্রামাণিক, আলেম খাঁ, মানিক হালদার, জনাব আলি খাঁ, গীতা ঘরামী, জব্বার খাঁ।

নলগোড়া ঃ কমরেডস্ কার্তিক বৈদ্য, দুলাল বৈরাগী, অশোক হালদার, মোসলেম মিস্ত্রী।

চুপড়িঝাড়া ঃ কমরেডস্ মুছা নস্কর, অম্বিক মণ্ডল, শশধর বর, আবেদালি সেখ, আমজেদ পিয়াদা, কৃপাসিন্ধু হালদার।

গুড়গুড়িয়া-ভুবনেশ্বরী ঃ কমরেডস্ দুর্গা মুদি, নগেন মণ্ডল, গোষ্ঠ আড়ি, সুষেণ মাইতি, দিলীপ গিরি, অনন্ত প্রধান, সুবল মণ্ডল, কৃত্তিবাস গিরি, গোপাল ঘোষ, মনোরঞ্জন শাসমল, জয়দেব পাইক।

মনিরতট ঃ কমরেডস্ হাকিম সেখ, হাসেম খাঁ।

মেরিগঞ্জ - ১ ঃ কমরেডস্ মোকাররম খাঁ, সায়ফুল খাঁ, রুকুদ্দিন খাঁ।

মেরিগঞ্জ - ২ ঃ কমরেড বিমল মণ্ডল।

জালাবেড়ে - ১ ঃ কমরেডস্ সাহেব আলি মোল্লা, জয়নাল সর্দার, হৃদয় সর্দার, গোপাল নস্কর, ইয়াদ আলি সেখ, নূর আলম মোল্লা, সইদুল সেখ, মান্নান সর্দার, আবুতাহের সর্দার, আনন্দ সর্দার, গোঁসাই সর্দার, লিয়াকৎ আলি, গুরুপদ সর্দার।

জালাবেড়ে - ২ ঃ কমরেডস্ সাজেদালি মোল্লা, পঞ্চুরাম নস্কর, শ্রীকান্ত কয়াল, বঙ্কিম মণ্ডল, মুছা লস্কর, মোবারক লস্কর, জনাব লস্কর, অঞ্জলি নস্কর।

গোদাবর কুন্দখালি ঃ কমরেড ইব্রাহিম মোল্লা।

বাইশহাটা ঃ বিশিষ্ট কৃষক নেতা, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড আমির আলি হালদার (মাষ্টারদা), কমরেডস্ আব্দুল ওয়াব মোল্লা, মনসুর আলি মণ্ডল।

মৈপীঠ ঃ কমরেডস্ দুলাল ঝকড়, ভূপতি মণ্ডল, সুধীর মণ্ডল, ভক্তি জানা, আরতি জানা, নিমাই পুরকাইত, সুখময় পুরকাইত, উত্তম মুণ্ডা, পালান হালদার, আওলাদ সেখ, পূর্ণিমা ঘোড়ুই।

উল্লেখ্য, এই তালিকার সঙ্গে জয়নগর সহ অন্যান্য এলাকার শহীদ নেতা-কর্মী-সংগঠকদের নাম যুক্ত করলে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৯ জন। ২৮ জন এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীকে সিপিএম ষড়যন্ত্র করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করিয়েছে, আর ৫০ জনকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ঐদিকেই ঠেলছে এবং শত শত নেতা-কর্মী-সংগঠকের উপর চাপিয়ে রেখেছে অসংখ্য মিথ্যা মামলা।

বহুজাতিকের মুনাফার স্বার্থই চুক্তিচাষের মূলে

একের পাতার পর

এই সব পরিবর্তন দেশের কৃষিক্ষেত্রে একটা নতুন জোটবন্ধনের জন্ম দিয়েছে। দেশীয় একচেটিয়া শিল্পপুঁজি ও কৃষিপুঁজির মধ্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বার্থের বিরোধ সত্ত্বেও সর্বোচ্চ মুনাফার প্রেক্ষাপটে এক মৈত্রীবন্ধন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, নয়া আর্থিক বা শিল্পনীতিকে একচেটিয়া পুঁজির বিভিন্ন সংগঠন (সিআইআই, ফিকি, এ্যাসোচাম ইত্যাদি) যেমন সমর্থন করেছে, তেমনি সমর্থন করেছে শারদ যোশীর খেতকারী সংগঠন বা পাঞ্জাব-হরিয়ানার কুলাক লবি। উভয়েই অর্থনীতির তথাকথিত বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় আরও বাজার ধরতে চাইছে এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত গুণমানের কৃষিপণ্য তৈরি করতে চাইছে। এই কারণেই নতুন কায়দায়, নতুন কৌশলে এরা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে চাইছে।

গ্রাম-শহরের পুঁজির এই জোটবন্ধনের সাথে যুক্ত হয়েছে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থ। দেখা যাচ্ছে, দেশি-বিদেশি পুঁজির মধ্যে বিশাল বিশাল যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। বাজার বিশ্লেষণ করে ওরা দেখেছে, দেশের অধিকাংশ মানুষ পেটভরে খেতে না পেলেও মুষ্টিমেয় ধনী ও মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার হিসাবেই আগামী দশকে এদেশে একমাত্র তৈরি-খাবারের চাহিদাই দাঁড়াবে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকার। এই বাজার ধরতে গেলে লগ্নির প্রয়োজন হবে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা। ওদের ধারণায়, বিদ্যুৎ বা টেলিযোগাযোগ শিল্পের চেয়েও অর্থনীতিতে এর প্রভাব হবে অনেকগুণ বেশি। এই প্রয়োজন থেকে ওরা এদেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। ওদের বক্তব্য হল — (ক) প্রধানত দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষিতে এতদিন ধরে যে ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তার পরিবর্তন করতে হবে, (খ) রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে হবে, (গ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে হবে।

এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশে কৃষিপণ্য উৎপাদনকে নবরূপে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, রাজস্থানে রেপসিড, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তৈলবীজ ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। গমের জায়গায় টম্যাটো, ধানের জায়গায় ফুলচাষ প্রাধান্য পাচ্ছে। কেরলে বনাঞ্চল ও ধানজমির একটা বড় অংশকে রবার, কফি ও নারকেল বাগিচায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও এই প্রক্রিয়া ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। এরাজ্যে হল্যান্ডের বাজারে বিক্রির উপযোগী গোলাপ চাষ হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সস্তার মোটা চাল পাবে কি না তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

১৯৯৭ সালে তৎকালীন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন — ''মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজিবিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১-৫-৯৭) এই 'পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ' করতে গিয়ে ওরা একে একে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের নানা ধারা সংশোধন করেছে, বর্গাদার উচ্ছেদকে আইনসঙ্গত করেছে এবং শিল্পপুঁজি যাতে পছন্দমতো জায়গায় প্রয়োজন মতো জমি পেতে পারে তার আইনি বন্দোবস্তও করেছে। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের সাথে এইভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজির ঘনিষ্ঠতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশি-বিদেশি পুঁজি ক্রমাগত রাজ্য সরকারের কাছে তাদের চাহিদার তালিকা পেশ করছে এবং রাজ্য সরকারও প্রাণপণে গরিব মেরে তাদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে। কারগিল ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি বিভাগের প্রধান বলেছেন — ''আমরা আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চাল সংগ্রহের কথা ভাবিনি। আমরা জানতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ আমাদের কী দিতে পারে। তারপরই আমরা বিচার করব, সেগুলি আমাদের চাহিদা মেটাবে কি না।'' মার্কিন এই বহুজাতিক কোম্পানি রাজ্যের কৃষি থেকে কীভাবে মুনাফা করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। ম্যাকিন্‌সেও তাদের রিপোর্টে বলেছে, এখনই দশটা দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। বুঝতে অসুবিধা হয় না, রাজ্যের কৃষক ও কৃষিকে শোষণ করে নিজেদের মুনাফার থলি পূর্ণ করতে দেশি-বিদেশি পুঁজি কতটা উদগ্রীব। তাদের এই স্বার্থ ও চাহিদাকে রাজ্য সরকার নানাভাবে পূর্ণ করার চেষ্টা করছে এবং তাকেই 'জনমুখী', 'উন্নয়নমুখী' প্রচেষ্টা বলে চালিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করছে।

রাজ্য সরকার যে খসড়া কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছিল তার মূল কথা ছিল —

১। খাদ্যশস্য উৎপাদনে জোর দেওয়ার নীতি পরিবর্তন করে তৈলবীজ, ডাল, ফল, ফুল, শাকসবজি ইত্যাদি অর্থকরী ফসল (ক্যাশক্রপ) উৎপাদনের উপর জোর দিতে হবে;

২। ধানচাষে জমির পরিমাণ কমাতে হবে ১৩ লক্ষ হেক্টর। ঐ জমি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে;

৩। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ জোন তৈরি করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমের সহায়তায় নানা ধরনের বাণিজ্যিক ফল-ফুল উৎপাদন ও বিপণন করবে;

৪। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের জন্য দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে কৃষকদের এক ধরনের চুক্তি হবে এবং তার ফলেই কৃষক ভূমি ব্যবহার, ফসল উৎপাদন বা বাজার সম্পর্কে সর্বাধুনিক প্রকৌশলের অধিকারী হবে;

৫। আর এই সমস্ত কাজে চাষী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে পঞ্চায়েত।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনায় একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে। আর তা করা হবে তাদের সঙ্গে রাজ্যের ক্ষুদ্র কৃষকদের এক ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে। বলা হচ্ছে, 'পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভর দিয়েই' চলবে এই চুক্তিচাষ। পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভর করে, নাকি নতজানু হয়ে বাংলার কৃষককে সর্বস্ব খোয়াতে হবে, এবার সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক্।

চুক্তিতে চাষ ঃ কেন, কার স্বার্থে

দেশি-বিদেশি পুঁজি, কেন্দ্র-রাজ্য সরকার ও তাদের তল্পিবাহক কৃষি বিশেষজ্ঞরা যখন চুক্তিচাষের জয়গানে মুখর, তখন মনে পড়ে পরাধীন ভারতে বাংলার নীল চাষীদের দুর্দশার কথা। তারাও নীলকর সাহেবদের সাথে চুক্তিতেই চাষ করতেন। শুরুতে চাষীরা চরম জমিদারি অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হবার আশায় চুক্তিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং কিছু বাড়তি টাকাও পেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই ঔপনিবেশিক শোষণ নগ্ন হয়ে যায়। কেমন ছিল সেই নীলকরদের চুক্তি? বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির মফঃস্বল ম্যানেজার টমাস লারসুর ১৮৬০ সালে নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলার চাষীদের জমিতে, তাদের অতিরিক্ত শ্রমে আমরা সারা পৃথিবীর বাজারে ব্রিটেনের জন্য নীলের এক বিশাল বাজার তৈরি করেছি এবং বাংলার মাত্র দুটো জেলা থেকেই ৩ কোটি পাউন্ড লাভ করেছি। কীভাবে? যখন বাজারে নীলের দাম মণ প্রতি ১০ থেকে ৩০ টাকা, তখন দাদনচুক্তি অনুসারে চাষী পাচ্ছে ৪ টাকা। এর ফল কী হয়েছিল? আমাদের অধীনে দাদন প্রথায় যে ৩৩,২০০ জন রায়ত নীল চাষ করে, তাদের মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন আগাম অর্থ পরিশোধ করে সামান্য কিছু লাভ করতে পেরেছিল। বাকি ৩০,৭৫২ জন রায়ত দাদন শোধই করতে পারেনি; তারা তাদের বোনা নীলগাছ কুঠিতে পৌঁছে দেয় বিনা পয়সায় এবং নিরুপায় হয়ে পরের বছরের জন্য একই শর্তে নীল চাষের দাদনপত্রে দস্তখত করে।' নীলচাষের সেই কালো দিন উন্নয়নমুখী (!) চুক্তিচাষের নামে ভিন্নরূপে আবার বাংলায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

আমরা জানি, সাধারণত বহুজাতিক পুঁজি ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রিকার দেশে দেশে বড় বড় খামার প্রথায় চাষ করে। এতে তাদের সুবিধা হল, বড় খামারে ব্যাপকভাবে যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, ফলে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রথায় কোম্পানিকে নিজস্ব শ্রমিক রেখে ফসল ফলাতে হয়। ফলে নির্দিষ্ট মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্তু চুক্তিচাষে সেই ঝামেলা নেই। তাই ম্যাকিন্‌সে রিপোর্টেও বলা হয়েছে — ''with the increase in labour costs these companies are moving away from managing captive farms to model like contract farming where they work closely with independent farmers''. অর্থাৎ মজুরির খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে বহুজাতিক পুঁজি জমির মালিক হয়ে বড় বড় খামার তৈরির পথ থেকে ক্রমশই চুক্তিচাষের দিকে সরে যেতে চাইছে।' ওরা দেখেছে এই প্রথায় ওদের লাভ হবে তিন প্রকারে —

১। মজুরি খাতে এক পয়সাও খরচ হবে না। ছোট চাষী নিজেরাই চাষ করবে বা প্রয়োজনে তারাই খেতমজুর নিয়োগ করবে। বহুজাতিক কোম্পানি ঝুঁকি ও দায়িত্ব ছাড়াই সামান্য দাম দিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য পেয়ে যাবে।

২। খুশিমতো চুক্তি বাতিল করা যাবে। বহুজাতিক কোম্পানির চাহিদা মতো মুনাফা হলে চুক্তি বহাল থাকবে, না হলে বাতিল। শিল্পের ক্ষেত্রে ওরা যেমন এক্সিট পলিসির দাবি জানিয়েছে, অর্থাৎ যখন খুশি পুঁজি তুলে নিয়ে চলে যাওয়া — চুক্তিচাষ ওদের হাতে কৃষিক্ষেত্রে সেই সুযোগ তুলে দিচ্ছে।

৩। এই প্রথায় জমি যেহেতু চাষীর, তাই তার থেকে অল্প সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা কামিয়ে জমিকে যথেচ্ছ ব্যবহারে বন্ধ্যা করে ফেলে পরিবেশের অশেষ ক্ষতি করে ওরা চলে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটা বিশেষ পরিস্থিতির কথা ওরা মাথায় রাখতে বাধ্য হয়েছে। এ রাজ্যে ৯৩ শতাংশ জোতই হল ক্ষুদ্র এবং এই জোতগুলির কৃষিজমির পরিমাণ রাজ্যের মোট কৃষিজমির ৭২ শতাংশ। তাই এ রাজ্যে রাতারাতি বড় জোত গঠনেও অসুবিধা আছে। আবার এই রাজ্যে বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনের ফলেই ভূমিহীনরা জমির মালিক হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের চাপে এই রাজ্যে কয়েকবার জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষক আন্দোলনের এই অতীত ঐতিহ্যের কথাও ওদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া এ রাজ্যের শাসকদের একটা বামপন্থী মুখোশ চাই। এই সমস্ত কারণে রাজ্য সরকারের পক্ষে এখনই বহুজাতিক পুঁজির হাতে তাদের প্রয়োজন মতো জমি তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, যদিও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এই অসুবিধার কথা ম্যাকিন্‌সে রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে — ''ছোট কৃষকদের জমি দেওয়ার আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশাল বিশাল খামার গড়ে তোলবার মতো জমি পাওয়াই এই সমস্ত কোম্পানিগুলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে।''

এই অসুবিধা ও চুক্তিচাষের বিশেষ সুবিধা — সব মিলিয়েই বহুজাতিক পুঁজি মনে করছে, মালিকানার ভিত্তিতে বড় খামার গড়ে তোলার চেয়ে ছোট ছোট অসংখ্য কৃষকের সাথে চুক্তিতে যাওয়াই সুবিধাজনক। চাষীকে জমির মালিকানা ছাড়তে না বলে চাষীদরদী সাজা এবং জমিশুদ্ধ চাষীকে বহুজাতিকের দাসত্বে বেঁধে ফেলার যে পরিকল্পনা সিপিএম নিয়েছে — তারই নাম চুক্তিচাষ। চাষী জমির মালিক থাকছে — একথা বলে তারা চাষীকে ঠকাচ্ছে এবং সেই সাথে কৃষিকে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় জুড়ে দেওয়ার পুঁজিবাদী চক্রান্তের সক্রিয় শরিক হিসাবে কাজ করছে সিপিএম।

কেমন সেই চুক্তি

এই যে চুক্তিচাষের কথা বলা হচ্ছে — তা চুক্তি হবে কাদের মধ্যে? চুক্তি হবে বহুজাতিক কোম্পানির সাথে অসংখ্য ছোট ছোট কৃষকের। দুই পক্ষের ক্ষমতার বৈষম্য এবং বহুজাতিক পুঁজির চরিত্র বিচার করে সহজেই বলা যায়, এই চুক্তির প্রকৃতি হবে অসম। এক পক্ষে সহায়সম্বলহীন নিরন্ন অভুক্ত জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত সাধারণ কৃষক, অন্যপক্ষে বিপুল পুঁজির শক্তিতে বলীয়ান মহাশক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে হাজির বহুজাতিক কর্পোরেশন। ফলে কাগজে-কলমে যাই লেখা থাক না কেন, চুক্তি যে এইসব মহাশক্তিধর কর্পোরেট সংস্থাগুলোর স্বার্থরক্ষার অনুকূলে হবে, এটা বুঝতে অর্থনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে যাই হোক, প্রশ্ন হল এই চুক্তির ধরন কী হবে? সরকারি খসড়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু নেই। কিন্তু এই খসড়ার উদ্ভব যেখান থেকে সেই ম্যাকিন্‌সে রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলা হয়েছে, চুক্তির ধরন হবে এইরকম —

ক) জমিতে কী ধরনের ফসল হবে তা ঠিক করবে বহুজাতিক কোম্পানি,

খ) জমিতে কী ধরনের বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ কী পরিমাণে দিতে হবে তাও ঠিক করবে কোম্পানি,

গ) প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন নির্দিষ্ট সুদে চাষীকে ঋণ দেওয়া হবে,

ঘ) ফসল ওঠার পর কিছু অংশ নির্দিষ্ট দামে, বাকিটা বাজারদরে চাষীর কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে।

ঙ) প্রাকৃতিক বা অন্যান্য কারণে ফসলের ক্ষতি হলে তার দায়ভার কোম্পানি বহন করবে না, সমস্ত দায় চাষীকেই বহন করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, ম্যাকিন্‌সে রিপোর্টে এইসব শর্তের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে চুক্তির সময় এর সাথে অন্যান্য নতুন শর্ত যুক্ত হবে না — এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই।

সে যাই হোক, ম্যাকিন্‌সে উল্লিখিত চুক্তির এই ধরনগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা কী পাই? (এক) যে ধরনের শস্যের বাইরের বাজারে চাহিদা আছে, এ রাজ্যের জল, হাওয়া, মাটি যার ফলনের উপযোগী — এমন ধরনের ফসলের উৎপাদনের দিকেই লক্ষ্য দেওয়া হবে। ফলে, সাধারণ মানুষের উপযোগী সস্তা দরের খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে ধীরে ধীরে এই ধরনের বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে বেশি। (দুই) রাজ্যের কৃষিজমিতে ফসলের পরিবর্তন শুধু বিশ্ববাজারের দিকে তাকিয়েই হবে না, আরেকভাবেও হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মালিকরা যা চাইবে তাই ফলানোর জন্য চেষ্টা করা হবে। বোতল ও কৌটোয় ভরা খাবার, প্যাকেটের খাবার তৈরির বৃহৎ কোম্পানি যা চাইবে সেইভাবেই কৃষিকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা হবে। (তিন), ফসল

ছয়ের পাতায় দেখুন

চুক্তিচাষ কৃষককে আত্মঘাতী হতে বাধ্য করবে

পাঁচের পাতার পর

তৈরির জন্য উপযুক্ত বীজ সরবরাহ করবে বহুজাতিক কর্পোরেশন। মনে রাখতে হবে, এই সব বহুজাতিক কোম্পানিগুলি শুধু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেরই মালিক নয়, এরা বীজ ব্যবসায়েরও একচেটিয়া কারবারি। চাষীকে এদের সরবরাহ করা বীজে চাষ করতে বাধ্য করার অর্থই হল শুধু বীজের ব্যবসায় লাভ নয়, সেই বিশেষ বীজের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সার ও কীটনাশক বিক্রি করেও লাভ করা। এইসব বহুজাতিক কর্পোরেশন ভাল করেই জানে, সাবেকি ধরনের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজে মুনাফার হার অনেক কম। বাণিজ্যিক ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সংকর বীজে বা আরও আধুনিক বীজে মুনাফার হার অনেক বেশি। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ও বিদেশি পুঁজির যৌথ উদ্যোগে বীজ ব্যবসায়ীরা বীজ বিক্রি করে বিশাল মুনাফা করছে। হিসাব কষে ওরা দেখেছে, ভারতের বীজ-বাজার থেকে সাবেকি বীজ শতকরা ৫০ ভাগ অপসারিত করতে পারলে ওদের বাৎসরিক মুনাফা বৃদ্ধি পাবে ৬ হাজার কোটি টাকা। এইভাবে চাষীকে বীজের জন্য বহুজাতিক কর্পোরেশনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে ফেলে ওরা চাষের সমগ্র প্রক্রিয়াকে দখল করে ফেলতে চায়। চুক্তিচাষ ওদের এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হতে আরও অধিকতর সাহায্য করবে। (চার), বলা হচ্ছে, ফসল ওঠার পর বাজারদরে চাষীর কাছ থেকে ফসল কিনে নেওয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করবে কারা? সন্দেহ নেই, এটা নিয়ন্ত্রণ করবে মুষ্টিমেয় বহুজাতিক কোম্পানি। তারা যে দর বেঁধে দেবে সেই দরেই চাষীকে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হতে হবে। এখন বিক্রি করতে হয় ফড়েদের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীদের কাছে, তখন বিক্রি করতে হবে আরও মুষ্টিমেয়, আরও ক্ষমতাশালী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে। মুনাফার জন্য চাষীর গতর আর জমির উর্বরতা নিংড়ে নিতে যারা আসছে সেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চাষীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে, তা কি বিশ্বাস করা যায়? (পাঁচ), চুক্তির এমনই মহিমা, প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে ফসল মার খেলে দায় চাষীর, কোম্পানি কোন দায় বহন করবে না। ফলে কোম্পানির কাছ থেকে দাদন নিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল ঘরে তুলতে না পেরে একবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তাই নামে মালিক থাকলেও ঋণগ্রস্ত বাংলার কৃষক গভীরতর ঋণজালে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করবে, এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় তার থাকবে না। ফলে কোম্পানি যা বলবে তাই তাকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। গ্রামবাংলায় সৃষ্টি হবে নতুন এক ধরনের ক্রীতদাস।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুরগি চাষীদের করুণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আমরা জানি, মুরগি চাষের ক্ষেত্রে জমি, ঘর ও শ্রম চাষীর; বাচ্চা, খাবার, ওষুধ ইত্যাদি যোগায় বহুজাতিক কোম্পানি। মুরগি তৈরি হবার পর কী দামে বিক্রি হবে তা ঠিক করে ওই বহুজাতিকের এজেন্টরা। মুরগি রোগে মারা গেলে দায় চাষীর। তাই, বহুজাতিক কোম্পানির লাভ দুই ধরনের। এক, মুরগির বাচ্চা, ওষুধ, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করে লাভ। দুই, চাষীর কাছ থেকে কমদামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ। এক্ষেত্রে কোম্পানির কোন ঝুঁকি নেই। ষোল আনা ঝুঁকি চাষীর। তারই সর্বস্ব চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্যে মুরগি চাষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট চাষী ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে, অপরদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার পাহাড় ক্রমশই স্ফীত হচ্ছে। কি সুন্দর চুক্তি! লাভ আমার, লোকসান তোমার। এই ধরনের চুক্তিচাষই এবার রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে চালু হতে চলেছে।

চুক্তিচাষ ও কৃষিবিজ্ঞানী স্বামীনাথনের বক্তব্য

আমরা আগেই বলেছি, চুক্তিচাষ নিয়ে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে স্বামীনাথনের এক বৈঠক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নিভৃত বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ জানা অসম্ভব। স্বয়ং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীও এ ব্যাপারে অন্ধকারে। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন — ''স্বামীনাথনের সঙ্গে যে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক ছিল, তিনি যে মহাকরণে আসছেন, তা আমি জানতামই না। আমাকে তো কেউ কিছু জানাননি!'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩-৫-০৬)। এই যখন অবস্থা তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত চুক্তিচাষ প্রসঙ্গে স্বামীনাথনের বক্তব্যকে প্রামাণ্য ধরে নিয়েই আমাদের আলোচনা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে গত ২৩ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর বক্তব্য বলে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা হল —

১। ''চুক্তিচাষ আদতে কৃষকের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বরং চুক্তি অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ন্যূনতম মূল্য পাওয়া সুনিশ্চিত হওয়ায় কৃষকের আয়ের পথ খোলাই থাকে।''

২। ''এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে যাতে নির্দিষ্ট কোড অব্ কন্ডাক্ট বা আচরণবিধি মেনে চলা হয়, তা নিশ্চিত করতে পারলে সমস্যা দানা বাধে না।''

৩। ''চুক্তিচাষের সঙ্গে কর্পোরেট ফার্মিং বা বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থার কৃষিতে দাদন দিয়ে চাষ করানোর বিষয়টি যেন গুলিয়ে ফেলা না হয়।''

৪। ''কেন্দ্রও তো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সহায়ক মূল্য বেঁধে দিয়ে চাষ করায়। এটাও তো চুক্তিচাষ। কৃষক যদি সহায়ক মূল্য পান, তা হলে কোন অসুবিধাই নেই। সরকারি সংস্থা বা বেসরকারি কোনও সংগঠন, যার সঙ্গেই কৃষকের চুক্তি হোক, সহায়ক মূল্যের সংস্থানটা জরুরি।''

এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার চুক্তিচাষকে গ্রহণযোগ্য করানোর জন্য ডঃ স্বামীনাথন নানা কথা বলেছেন এবং সবচেয়ে জোর দিয়েছেন চাষীর 'সহায়ক মূল্য', পাওয়ার বিষয়টির উপর। বিশ্বের নানা জায়গায় যেখানে দীর্ঘদিন ধরে এই চুক্তিচাষের প্রচলন আছে সেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলি কেমন 'সহায়ক মূল্য' দিয়ে থাকে তা আমরা পরে আলোচনা করে দেখাব। কিন্তু স্বামীনাথনের বক্তব্য উপস্থাপনার ধরন দেখে যেটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, তা হল — তিনি চুক্তিচাষকে কৃষকের উপকারী বলে ধরেই নিয়েছেন এবং তারপর তার পক্ষে যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু এরকম তো উচিত নয়। স্বামীনাথন তো একজন সরকারি আমলা নন, তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং বিষয়ের সমগ্রতার প্রেক্ষিতেই বিচার দাবি করে বিজ্ঞান। তাই স্বাভাবিকভাবেই একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাজ হল, এই চাষ প্রচলনে সুবিধা-অসুবিধার সমগ্র প্রেক্ষিতটা আলোচনা করা, এই প্রথায় চাষ চালু করার ফলে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা বিচার করা এবং তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু স্বামীনাথন বিজ্ঞানী হিসাবে এই সাধারণ কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নিজের ধারণা মতো তিনি এর সুবিধাজনক দিকের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অসুবিধাজনক দিকগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। দেখা যাক, এই প্রথা প্রচলনে বিশ্বব্যাপী কী অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি।

''A review ... in the context of African and Latin American countries reveals that contract has led to many ill-effects in the spheres of livelihoods of producers, community organisations and other institution, environment and gender''.

''Though the contract system leads to better incomes and employment in the beginning, the relations between firms and farmers worsen over time and the system results in ecological and economic degradation of local production systems''.

''Most of the studies find contracts inevitable, short-term, and ambiguous''.

''A FAO report on the Royal Project also states : However, this method (contract farming) has not yet been successfully implemented to the industries''.

''There is considerable evidence to show that in general benefits have not been sustainable, farmers have been indebted and worse off due to contract farming project failure... and many social and environmental conservances have been particularly serious''.

(Source : Eeconomic and Political Weekly. EPW. 31.12.2005)

অর্থাৎ, সংক্ষেপে যা অভিজ্ঞতা, তা হল, এই চুক্তিচাষ প্রথা (১) কৃষকের জীবনে দৈন্য ডেকে আনে, (২) পরিবেশ দূষিত করে, (৩) স্থানীয় কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার অধঃপতন নিয়ে আসে, (৪) সামাজিক জীবনের বিকৃতি ঘটায়, (৫) এই চুক্তি অসম, ক্ষণস্থায়ী এবং উদ্ভট এবং (৬) এর ফলে কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

চুক্তিপ্রথার পক্ষে যাঁরা ওকালতি করছেন তাঁরা আর একটা কথাও বলছেন। দেশি-বিদেশি পুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করলেই কৃষকের উন্নয়ন ঘটবে। সত্যিই কি তাই? কী অভিজ্ঞতা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলির? মেক্সিকো, হন্ডুরাস, ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া বা সুদান-মরক্কোর অবস্থা তো ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষক সর্বস্ব হারিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ একর জমি বন্ধ্যা। হন্ডুরাসের অর্ধেক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। 'এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স' পত্রিকায় বলা হয়েছে — ''সরকারি কর্তাদের বহু টাকা ঘুষ দিয়ে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ইউনাইটেড ফ্রুটস্ মধ্য আমেরিকায় প্রচুর জমি লিজ নিয়ে কলা চাষ করেছিল। এর ফলে তাদের ভাঁড়ারে শত শত কোটি টাকা মুনাফা হিসাবে ঢুকেছে, কিন্তু হাজার হাজার কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, অনেককে হত্যা করা হয়েছে এবং এগুলি সবই হয়েছে উন্নয়নের নামে।'' (Annual Report on Workers' Right, Agricultural Workers, 2001)। বিশ্বব্যাপী এই অভিজ্ঞতার কথা জানা আছে বলেই জনগণের বিরুদ্ধতায় জল ঢালতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি চুক্তিচাষের কুফল খতিয়ে দেখতে কমিশন বসিয়েছে, বাস্তবে যার উদ্দেশ্য চাষীদের ধোঁকা দেওয়া।

এবার আসা যাক্, ডঃ স্বামীনাথন কথিত 'সহায়ক মূল্য' প্রসঙ্গে। এই প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা কী? কী ধরনের 'সহায়ক মূল্য' কৃষকদের দিয়ে থাকে বিভিন্ন বহুজাতিক কর্পোরেশন?

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার ৩১.১২.২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশ — চুক্তিচাষে সহায়ক মূল্য হিসাবে যা দেওয়া হয় তা বাজারদরের চাইতে অনেক কম। এই তো হল সহায়ক মূল্যের অবস্থা। অধিকাংশ সময়ই বাজারদরের থেকে কম দামেই বহুজাতিক পুঁজি চাষীর কাছ থেকে ফসল কিনে থাকে। 'সহায়ক মূল্যে'র সহায়তাই বটে!

চুক্তিচাষকে গ্রহণযোগ্য করানোর জন্য স্বামীনাথন কেন্দ্রীয় সরকারের দু-একটি কৃষিজ পণ্যের সহায়ক মূল্যের ঘোষণাকে চুক্তিচাষ বলে চিহ্নিত করেছেন। সত্যিই কি স্বামীনাথন কথিত এই সহায়ক মূল্যের ঘোষণাকে 'চুক্তিচাষ' বলা চলে? এক কথায় উত্তর হল — না। কারণ, চাষী এই সহায়ক মূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য নন, অন্যদিকে চুক্তিচাষে এই বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া সহায়ক মূল্য দেয় সরকার, যার গ্যারান্টি আছে। কিন্তু চুক্তিচাষে বাস্তবে সরকার সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে, যা নয়া আর্থিকনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে সরকারি মধ্যস্থতা ছাড়া এই চুক্তি বাঘে-গরুতে সহাবস্থানেরই মতো। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়ক মূল্যের ঘোষণাকে কোনমতেই চুক্তিচাষের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

চুক্তিচাষকে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ করতে স্বামীনাথন আর একটা ভয়ঙ্কর যুক্তির আমদানি করেছেন। তাঁর মতে — ''যে সব রাজ্যে চাষীদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে চুক্তিতে চাষ চালু ছিল না। তা থাকলে অন্তত ন্যূনতম মূল্য পেতেন বিপর্যস্ত চাষীরা'' (আনন্দবাজার, ২৩-৫-০৬)। অর্থাৎ 'চাষীদের আত্মহত্যা যদি বন্ধ করতে চাও তবে চুক্তিচাষ চালু কর।' এই হল স্বামীনাথনের প্রেসক্রিপশন্। এই প্রেসক্রিপশনের চরিত্র বিচারের আগে দেখা যাক্, গ্রামীণ ভারতে যে চাষীরা হাজারে হাজারে আত্মহত্যা করছে তার কারণ কী? কারণ, ''The village as an institution has crumbled under the pressure of commercialization'' (EPW, 29.-06-02) অর্থাৎ বাণিজ্যিকীকরণের চাপে গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এর ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শুধু কর্ণাটকেই আত্মহত্যা করেছে ১০,৯৫৯ জন কৃষক। সবুজ বিপ্লবের স্বপ্নভূমি পাঞ্জাবেও মৃত্যুমিছিল। ''দেনার দায়ে পাঞ্জাবেও তুলাচাষীরা তাদের গৃহপালিত জীবজন্তু অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে, এমন অসংখ্য ঘটনার নজির রয়েছে'' (পাঞ্জাব ট্রিবিউন, ১৪.১০.৯৮)। ওই পত্রিকা আরও জানিয়েছে — ''কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ পাঞ্জাবের শতকরা ৯০ জন চাষী ঋণের জালে আবদ্ধ। এ পর্যন্ত ১৩৩টি আত্মহত্যার ঘটনা জানা গিয়েছে'' (সূত্র ঃ পূর্বোক্ত ৪-১-৯৮)। ট্রিবিউনের মতে — ''সরকারি বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী এ পর্যন্ত এক হাজার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।'' (২৪-৯-৯৮)। এই রাজ্যেও কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমবর্ধমান। একদিকে কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্পসামগ্রীর দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মূলধনের জন্য উচ্চ সুদে টাকা ধার এবং অন্যদিকে ফসল অলাভজনক দামে বিক্রি — ফলত ঋণজালে আবদ্ধ চাষী আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ গ্রহণ করেই জীবনযন্ত্রণা জুড়িয়ে থাকে। স্বামীনাথন কথিত চুক্তিচাষ কি এই সমস্ত সমস্যার একটারও সমাধান করতে পারবে? কম দামে সার-বীজ-কীটনাশক, সেচের বিদ্যুৎ-ডিজেল দিতে পারবে? কম সুদে বা বিনা সুদে টাকা ধার দিতে পারবে? ফসলের লাভজনক দামের নিশ্চয়তা দিতে পারবে? কোনটাই পারবে না, বরং সমস্যা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দুনিয়ার অভিজ্ঞতা হল — ''These contracted commodities required high inputs and exhibited great risk''. (EPW, 31.12.2005)। অর্থাৎ এই চুক্তিচাষের ফসলের জন্য অনেক বেশি সার, বীজ, কীটনাশক তেল, জলের প্রয়োজন, অর্থাৎ খরচ বাড়বে আগের থেকে বহুগুণ এবং ফসলের ন্যায্য দাম যে পাওয়া যাবে না — তাতো আমরা আগেই দেখিয়েছি। ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বাড়বে, বাড়বে আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যাও। 'চুক্তিচাষের আয়োজন' এই পরিণামই ডেকে নিয়ে আসবে গ্রামবাংলার কৃষকের জীবনে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

জনগণের বিরুদ্ধতায় শাসকশ্রেণীর চক্রান্তের সাফল্য অনিশ্চিত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(তিন)

এখন ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার মধ্যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে শোষিত মেহনতি জনগণের দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত হচ্ছে। এ দ্বন্দ্ব অবশ্য নতুন কিছু নয়। পুঁজিপতিশ্রেণী যখন থেকে ইতিহাসের পথ বেয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে তখন থেকেই এই দ্বন্দ্বও সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব হিসাবে অবস্থান করেছে। কিন্তু বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ যখন তার সর্বোচ্চ তথা শেষ স্তর সাম্রাজ্যবাদে উপনীত, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই তা বর্তমানের অনেক ঘটনার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজকের বিশ্ববাজারে যে প্রবল ও অনিরসনীয় সঙ্কট, তাকে খানিকটা সামাল দিতেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের পত্তন। বিশ্বায়ন বা বহুজাতিকতা — গালভরা নাম যাই হোক না কেন, এসবেরই মূলে রয়েছে ঐ প্রবল সঙ্কটকে মোকাবিলা করার নানা মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু যে চেষ্টাই তারা করেছে, তাতে সফল হওয়া দূরে থাক, বরং সঙ্কটের আরও গভীরে তারা নিমজ্জিত হয়েছে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানকার জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা ও দুঃখদুর্দশা। দেশে দেশে বেকার সমস্যা তীব্র রূপ ধারণ করেছে। অর্থনীতি স্থবিরতার চোরাবালিতে আটকেছে। এই সঙ্কট খুব স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে — যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ঐসব দেশে একের পর এক ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়া গণআন্দোলন, ব্যাপক বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ এমনকী কখনও আঞ্চলিক আবার কখনও দেশজোড়া বন্‌ধের মধ্য দিয়ে। ইউরোপের ঐসব দেশেরও জনসাধারণের ব্যাপক অংশ, শ্রমিক, কর্মচারী, চাষী, মধ্যবিত্ত এবং ছাত্রছাত্রীরা এইসব আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। ফ্রান্স ও হল্যান্ডের সাম্প্রতিক গণভোটের রায়েও সাধারণ মানুষের এই ব্যাপক অসন্তোষেরই প্রতিফলন ঘটেছে। ওসব দেশের শাসক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা অভিন্ন ইউরোপীয়ান সংবিধানের পক্ষে যে আওয়াজ তুলেছে, ফরাসি এবং ওলন্দাজ জনগণ ভোটে, সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফরাসি কমিউনিস্টদের এক উল্লেখযোগ্য অংশই, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি অফ দি ওয়ার্কার্স অফ ফ্রান্স (পি.সি.ও.এফ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি বা নিজেদের দলের মধ্যে থেকেই দলের সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকা পোল অফ দ্য কমিউনিস্ট রেনেশাঁস ইন ফ্রান্স (পি আর সি এফ) হয় স্বতন্ত্রভাবে না হয় ইউরোপের অপরাপর কমিউনিস্ট পার্টি, যেমন মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি অফ ডেনমার্ক, কমিউনিস্ট পার্টি ইন ডেনমার্ক বা কমিউনিস্ট পার্টি অফ দ্য স্প্যানিশ পিপল-এর সাথে যুক্তভাবে একই অভিমত প্রকাশ করেছে। (সূত্র ঃ কমিউনিস্ট ইনিসিয়েটিভ, ডিসেম্বর ২০০৪) সেই বিবৃতিতে তারা বলেছে, এই অভিন্ন ইউরোপীয়ান সংবিধান আসলে এক সর্বগ্রাসী প্রকল্প যার লক্ষ্য হল প্রতিটি সদস্য দেশে এক অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা, এক বৃহৎ ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলা; তারপর ধাপে ধাপে আরও নানা প্রতিক্রিয়াশীল চুক্তি চালু করা। যার মধ্য দিয়ে বৃহৎ পুঁজি ইউরোপীয় সংবিধানের সাহায্যে একটি বহুজাতিক কিন্তু অভিন্ন ইউরোপ রাষ্ট্র গড়ে তোলার পথে নতুনভাবে এগোতে চায়। এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কখন? যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে দেশে দেশে সামরিক হানাদারি চালাচ্ছে, আর অন্যদিকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া উদারনৈতিকতাবাদের নামে নিজেদের দেশে ও বিদেশে সর্বত্র প্রায় সবরকম রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও ছাঁটাই-এর আক্রমণ নামিয়ে আনছে এবং পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছে। পাশাপাশি এতদিন পর্যন্ত ঐসব দেশে প্রতিটি মানুষের কাজ পাওয়ার যে অধিকার অনেকটা মৌলিক অধিকারের মতই ছিল তাও ক্রমাগত সঙ্কুচিত করা হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নেমে আসছে নানা আঘাত। শ্রমিক নিয়োগে নমনীয়তার কথা বলে চাকরির নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সেখানে বাস্তবে কৃষি, শিল্প, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ, গবেষণা সবকিছুকেই ধ্বংস করা হচ্ছে, এমনকী যে সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে সেসব দেশের মানুষের এত গর্ব, তাও আজ বিপদের মুখে। অভিন্ন ইউরোপের নাম করে আজ তার ওপরও নেমে আসছে আক্রমণ। তথাকথিত বাম, দক্ষিণ, সোস্যাল-লিবারাল, আপসমুখী বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া, সংশোধনবাদী নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও সেখানে এইসব নীতি বাস্তবে কার্যকর করার সপক্ষে গলা মিলিয়েছে। সামরিকীকরণও এই নীতিগুলির অন্তর্গত। সেটাও পুরোদমে শুরু করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাত তুলে প্রস্তাবিত সংবিধানে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ইউরোপের মানুষের চোখে অভিন্ন সংবিধান নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণেরই আরেক রূপ

অর্থাৎ শাসকশ্রেণী যাই বলুক, ইউরোপের সাধারণ মানুষের চোখে এই নতুন অভিন্ন ইউরোপীয় সংবিধান আসলে বিশ্বায়নের লক্ষ্যে নেওয়া আরেকটি পদক্ষেপ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। যার একমাত্র লক্ষ্য হল বিশ্বায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির সুবাদে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়া পুঁজির জন্য আরও মুনাফা সুনিশ্চিত করা। সাধারণ মানুষের আরও সন্দেহ এই যে, এই সমগ্র পরিকল্পনাটির মধ্যেই আরও কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। তার মধ্যে একটা হল, এই সংবিধান চালুর মধ্য দিয়ে আসলে একচেটে পুঁজিপতিরা অর্থনীতির মন্দা ও বাজার সঙ্কটের পুরো বোঝা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ঘাড়ে চালান করে দিতে চাইছে এবং সেজন্য সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী কোন পদক্ষেপ নিতেই তারা পিছপা নয়। এরই ফলে মেহনতি জনগণের সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবা ব্যবস্থা ধ্বংস করা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হচ্ছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র একদা যেসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি চালু করতে বাধ্য হয়েছিল, তাও বন্ধ করা হচ্ছে। ইউরোপের সাধারণ মানুষের আজও যতটুকু স্বাধীনতা আছে, প্রতিবাদ জানানোর ও আন্দোলন করার অধিকার আছে, ইউরোপীয় সংবিধানের দ্বারা সেগুলিকেও খর্ব করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণের জাতীয় সার্বভৌমত্বকেও প্রস্তাবিত সংবিধান লংঘন করবে। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অবস্থা হয়ে উঠবে সবচেয়ে শোচনীয়। তারা হয়ে উঠবে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের শিকার। সেখানে একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় কমিউনিস্টবিদ্বেষীদের শাসনকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হবে, অন্যদিকে দেশগুলি ধীরে ধীরে পরিণত হবে শুধুমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলির পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় সস্তাশ্রম ও কাঁচামালের মজুত ভাণ্ডারে। এই ইউনিয়ন পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধবিরোধী শান্তির শক্তিগুলির পক্ষে কোন সহায়ক ভূমিকা নেওয়া দূরের কথা, ইউরোপের কমিউনিস্টদেরই অভিমত — এই নতুন জোট বিশ্বে আরেকটি নতুন আধিপত্যবাদী মেরুই তৈরি করবে, 'যা কখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় হয়ে কাজ করবে, কখনও বিশ্বে আধিপত্য কায়েমের প্রশ্নে আমেরিকার প্রতিপক্ষ হবে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও প্রস্তাবিত সংবিধানের আসল রূপটি ইউরোপীয় কমিউনিস্টরা স্পষ্ট ভাষায় উদঘাটিত করে দিয়েছে। তারা দেখিয়েছে যে, বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের একচেটে পুঁজির আরও সংহতির দ্বারা একদিকে তাদের ব্যাপক মুনাফা বৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে জনগণের জীবনে বেড়েছে বেকারি, দারিদ্র্য। এ সম্পর্কিত ফ্রান্সের কিছু পরিসংখ্যান ছবিটা আরও পরিষ্কার করে দেয়। অভিন্ন ইউরোপীয় সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সবচেয়ে সোচ্চার সমর্থক ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় বহুজাতিক কোম্পানি। তারাই প্রস্তাবিত সংবিধানের সমর্থনে ভোটের আগে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের সমর্থন জোগাড় করতে জিগির তোলার চেষ্টা করেছিল "সমৃদ্ধ ইউরোপের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ বল।" ফ্রান্সের এই ধরনের কোম্পানিগুলির মধ্যে ছিল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি 'টোটাল', শুধু ২০০৪ সালেই যার মুনাফার পরিমাণ ছিল ১০৯০ কোটি ডলার, যা কোনও একটি ফরাসি কোম্পানির মুনাফার ক্ষেত্রে সর্বকালের রেকর্ড। আর তা অর্জন করার জন্য নির্বিচারে ফ্রান্সে শ্রমিক ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রে এই কোম্পানি কোনওরকম কার্পণ্য করছে না। এরকমই আরেকটি সংস্থা হল বিখ্যাত কসমেটিক্স্ উৎপাদন সংস্থা 'লোরেল'। এরা তাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে বেতনই দেয় বছরে ৭৯ লক্ষ ডলার যা ফ্রান্সের মতো দেশেও সর্বোচ্চ। এই কোম্পানির মালিক বর্তমানে ১৩৭০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী। তিনি সেদেশের সবচেয়ে ধনী মহিলা। অন্যদিকে রয়েছে যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক সংস্থা স্লাইভার। গতবছর তাদের শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড বৃদ্ধির হার ছিল সে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ — ৬৩.৬ শতাংশ। প্রখ্যাত অস্ত্রনির্মাণ সংস্থা দাসো-র ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তারা আবার এই মুহূর্তে সেদেশের প্রচার মাধ্যমেরও এক বিরাট অংশকে কিনে নিয়ে তার মালিক হয়ে বসেছে। এরাই সাধারণ মানুষকে দিয়ে অভিন্ন ইউরোপীয় সংবিধানের প্রশ্নে 'হ্যাঁ' বলাতে তাদের মালিকানাধীন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে চেষ্টার কোনও কসুর রাখেনি। অপরদিকে ফ্রান্সে শ্রমিকদের অবস্থা কীরকম? প্রতি ছয়জন শ্রমিকের মধ্যে একজনকে সেদেশে ন্যূনতম মজুরির উপর নির্ভর করেই জীবন নির্বাহ করতে হয়; ৭০ লক্ষ মানুষ সেখানে প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়।

তাই ইউরোপের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা অভিন্ন ইউরোপীয় সংবিধানের প্রতি কোনও মোহ আজ আর অবশিষ্ট নেই। ফ্রান্স ও হল্যান্ডের মানুষ যে আজ ভোটে প্রস্তাবিত সংবিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তা আসলে সেখানকার শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষারই পরাজয়। পিসিওএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের প্রকাশিত বিবৃতিতে যথার্থই বলেছে, "এই জয় শুধুমাত্র একটি প্রতিরোধের চেষ্টা নয়, এই জয় বাস্তবে একচেটিয়া পুঁজির সেবার স্বার্থে রচিত নয়া উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া যৌথ সংগ্রামের এক প্রকাশ্য ঘোষণা।" সাথে সাথে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ এবং অভিন্ন সংবিধান, যা তারা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে পিসিওএফ কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রতিটি দেশের শ্রমিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির বড় আকারের ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলে এবং নিজ নিজ দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির সাথে যুক্ত করেই সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।

আমরা অবশ্যই আশা রাখব যে, শুধুমাত্র ফ্রান্স অথবা এরকম কোনও একটিমাত্র দেশের জনগণ নয়, সমগ্র ইউরোপের জনসাধারণই এই সংগ্রামে এগিয়ে আসবেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুন্দর পোষাকের তলায় লুকিয়ে রাখা ভয়ঙ্কর রূপ সকলের সামনে উন্মোচিত করে দেবেন।

সাধারণ মানুষের জাতীয়তাবাদী আবেগ আহত হয়ে বিরুদ্ধতা জাগিয়ে দিচ্ছে

উপরের আলোচনা থেকে একথা মোটামুটি পরিষ্কার যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যা ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই, গোটা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে। বাস্তবে এর মধ্য দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলি, সব না হলেও অন্তত ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক নতুন ধরনের ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রথমে তারা একটি অর্থনৈতিক জোট গঠন দিয়েই শুরু করে। যার লক্ষ্য ছিল প্রাথমিকভাবে নিজেদের মধ্যে আপসে বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা। আর, বর্তমানে তাদের চেষ্টা হল এই ব্যাপারটিকেই আরও সংহত করে একটি রাজনৈতিক ইউনিয়নের রূপ দেওয়া। অর্থাৎ অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা পার্লামেন্ট ও অভিন্ন সংবিধান নিয়ে একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন। কিন্তু বিশেষত সংবিধানের প্রশ্নে তাদের প্রচেষ্টা বর্তমানে একটা বড়সড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর চাহিদা যাই হোক না কেন, দেশের সাধারণ মানুষ মোটেই তাদের সাথে একমত নয়। ফলে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার পড়ছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করে উঠতে পারছে না। ব্যাপক প্রচারের দ্বারা কিছু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সফল হলেও অধিকাংশ মানুষকে পক্ষে আনতে পারছে না। ফ্রান্স ও হল্যান্ডের নির্বাচনে অভিন্ন সংবিধানের প্রশ্নে জনগণের এই বিরোধিতাই সমস্বরে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনা আরও একবার পরিষ্কার করে দিল যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন সদস্য দেশগুলির মানুষের মন থেকে জাতীয় আবেগ এখনও মুছে যায়নি, নিজ নিজ দেশকে কেন্দ্র করে এই আবেগ এখনও তাদের মধ্যে যথেষ্ট ভালভাবেই ক্রিয়াশীল এবং কোথাও তা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে। যেমন ফ্রান্সে বা হল্যান্ডে; কোথাও বা তা বাইরে থেকে হয়তো অতটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সেখানেও অন্তর্বাহী ফল্গুধারার মতোই তার চোরাস্রোত বয়ে চলেছে। এই বিরোধিতার বাহ্যিক কারণ হল পশ্চিম ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক বর্তমানে পুঁজিবাদী দেশগুলির মানুষের মনে একটা আশঙ্কা যে, যদি পূর্বইউরোপের দেশগুলিকে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে সেখান থেকে সস্তা শ্রমশক্তি স্রোতের মতো এসে পশ্চিম ইউরোপের বাজার ভরিয়ে ফেলবে। ফলে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের আর কোনও চাকরি থাকবে না। এও আসলে সেই একই 'জাতীয়' আবেগেরই এক রূপ, যার ফলে সাধারণ মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশের সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিতে রাজি না হয়ে একচেটে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে গড়ে ওঠা ইউনিয়ন ও তার প্রস্তাবিত সংবিধানকে একপ্রকার প্রত্যাখ্যানই করেছে। (ক্রমশঃ)

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বাংলাদেশ

উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচন রুখতে রাস্তায় নামার আহ্বান বুদ্ধিজীবীদের

ভারতের মতো প্রতিবেশী বাংলাদেশের বুর্জোয়া সরকারও শিক্ষার সর্বাত্মক বাণিজ্যিকীকরণের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও এডিবি'র ঋণের জালে আটকা পড়া বাংলাদেশ সরকার ওদের নির্দেশমতো একমুখী শিক্ষার নামে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষাকে পুরোপুরি ছাত্রছাত্রীদের ফি-নির্ভর করতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ২৬ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'মঞ্জুরি কমিশনের কৌশলপত্র (পলিসি ডকুমেন্ট) ঃ মূল্যায়ন ও করণীয়' শীর্ষক এই বৈঠকে দেশের শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারের দুরভিসন্ধির পর্দা ফাঁস করে আন্দোলনের আহ্বান জানান। এই বৈঠকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর অধীন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার তীব্র সমালোচনা করা হয়। অধ্যাপক খান সাওয়ার মুর্শিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাত্ররা, তারপর শিক্ষক, তারপরে সমাজ। সরকার যে টাকা দেয় তার মালিক সমাজ। বিশ্ববিদ্যালয় সরকার নয়, সমাজের কাছে জবাবদিহি করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব বিশ্বের চিন্তার প্রবাহকে আমাদের মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারায়। কৌশলপত্র ঐ চিন্তার প্রবাহকে বন্ধ করার সুপারিশ করেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আখতারুজ্জামান বলেন, বাজারের চাহিদা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা হতে পারে না। অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র, কারণ শিক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শাহীন রেজা নূর বলেন, শাসকগোষ্ঠী ছাত্রদের বাণিজ্যিক চিন্তায় আক্রান্ত করতে চায়, এর পরিণাম ভয়াবহ। অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, মঞ্জুরি কমিশনের কৌশলপত্র অনুযায়ী, উচ্চবিত্তের সন্তান ছাড়া কেউই উচ্চশিক্ষায় আসতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হবে মুক্তবুদ্ধির চর্চা কেন্দ্র। কিন্তু কৌশলপত্রে তা না বলে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের চেষ্টা হয়েছে। অধ্যাপক জিলুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, এই ডকুমেন্ট বাস্তবায়িত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবে।

২৬ মে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে গোলটেবিল বৈঠক

এদিনের গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ছাত্রনেতা খালেকুজ্জামান লিপন। সমস্ত বক্তাই ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের মতো আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের শিক্ষা নিধনকারী নীতি বাতিল করার আহ্বান জানান।

বীরভূমে নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান

গত ২৬ মে ভারতীয় নবজাগরণের আপসহীন ধারার অন্যতম বলিষ্ঠ প্রতিনিধি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১০৮তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল এ আই ডি এস ও মুরারই ইউনিটের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান, আবৃত্তি পরিবেশন, প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা সভা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের বীরভূম জেলা সভাপতি কমরেড বিজয় দলুই। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সামনে নজরুলের কাব্য-সাহিত্য চিন্তা ও জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে আজকের পরিস্থিতিতে সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় মুরারই থানার ভবানীপুর গ্রামে ছাত্র-যুব-মহিলা সহ বিভিন্ন অংশের মানুষের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-যুবরা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক কুদ্দুস আলি, সুবীর মুখার্জী এবং এ আই ডি এস ও'র বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি কমরেড সেলিম দাস।

তুরস্ক সম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জী

একের পাতার পর

(গ) নয়া উদারবাদ ও সমরবাদ।

প্রথম ওয়ার্কশপে যোগ দেন কমরেড মানিক মুখার্জী। এই ওয়ার্কশপে গুমখুন হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের মায়েরা নিজেদের জীবনের অসহায় মর্মান্তিক অবস্থার কথা প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের সন্তানদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ, তারপর থেকে তাদের কোনও খোঁজ নেই। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করলে কেবল বলে, খোঁজ চলছে। ঘরে আমাদের পুত্রবধূদের আমরা বলতে পারি না তাদের স্বামী নেই, নাতি-নাতনিদের বলতে পারি না তাদের পিতা নেই, নিজেরাও ভাবলে শিউরে উঠি যে, আমাদের সন্তানরা মৃত। এভাবে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গুমখুন করে দেওয়ার মত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তুরস্কে প্রবল আকার নিয়েছে সন্দেহ নেই, তবে বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশেই এ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতেও এ জিনিস ঘটে চলেছে বহুদিন ধরে। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মতো দুটি প্রদেশের ঘটনাবলী বাইরের দুনিয়াও কিছুটা জানে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশেও এ জিনিস ঘটছে। সিপিএম দলের শাসনে পশ্চিমবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম নয়। এসব রাজ্যে সরকারগুলির কৌশল কিছুটা আলাদা, বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যার গল্প তৈরি করে এখানে বন্দীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। গুমখুনের ঘটনাও এরাজ্যে ঘটছে, যেখানে পুলিশ যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের দেহ পর্যন্ত লোপাট করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে, যে মায়েরা আজ এখানে চোখের জলে সন্তানদের কথা বললেন, তাঁরা কেবল তুর্কী ছেলেমেয়েদের মা-ই নন, বিশ্বজুড়ে শোষণবিরোধী লড়াইয়ে নিযুক্ত সকল ছেলেমেয়েরই তাঁরা মা। এই বীর সাহসী মায়েরা এক মহান সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

কমরেড মুখার্জী বলেন, দেশে দেশে একই ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের, গণআন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের গুমখুন করে দেওয়া শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি সাধারণ ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে ব্যাপক অংশের মানুষকে নিয়ে যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে হবে তেমনই একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ যতক্ষণ টিকে থাকবে, ততক্ষণ এই বীভৎস অত্যাচার থেকে মুক্তি ঘটবে না। ফলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী সংগ্রামকেই আমাদের সর্বতোভাবে শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, একমাত্র সমাজতন্ত্রই মানবিকতাকে মর্যাদা দেয়, তাকে রক্ষা করে।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অব টার্কি অ্যান্ড নর্থ কুর্দিস্তানএর নেতাদের সঙ্গে কমরেড মানিক মুখার্জীর নানা আদর্শগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

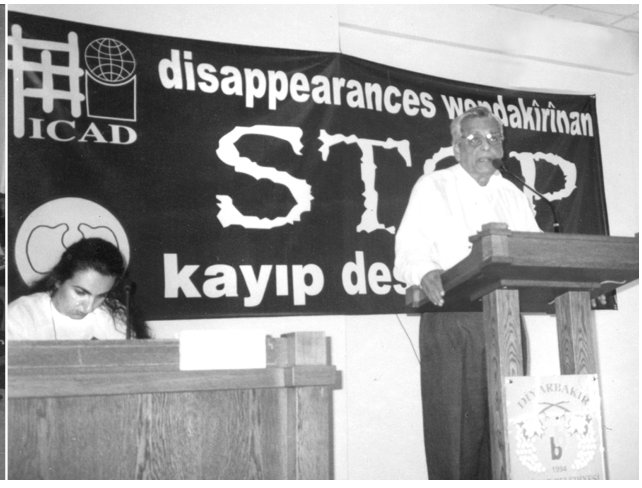

তুরস্কে গুমখুনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সেমিনার ঃ (বাঁদিকে) প্রতিনিধিদের একাংশ, (ডানদিকে) অন্যতম বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in